(6) قصص من التاريخ الاسلامی للاطفال

از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: محمد صادق حسین

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

قصص من التاريخ الاسلامى للأطفال

ঈমানদীপ্ত
কিশোর কাহিনী

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

মুহাম্মদ সাদিক হোসেন
অনুদিত

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

ঈমান দীপ্ত কিশোর কাহিনী
মূল : সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ সাদিক হোসাইন

প্রকাশকাল
জুন ২০১৬ ঈসায়ী; জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ; শাবান ১৪৩৭ হিজরী

গ্রন্থস্বত্ত ঃ প্রকাশক

প্রকাশক ঃ মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাঃ 01822-806163; 01728-598440

মুদ্রণে : মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
সালসাবিল

ISBN: 978-984-91841-9-5

মূল্য : ১৩০.০০ (একশত ত্রিশ) টাকা মাত্র

IMAN DIPTO KISHOR KAHINY: Written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvee (Rh) in Urdu and Translated by Muhammad Sadik Hossaininto in to Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf, M/s Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar (Ground Floor), Dhaka - 1100. Printed by M/s Tawakkal Press, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000; BANGLADESH.
Cell : 01822-806163 Price Tk. 130/- & U S $ 5.00 only

উৎসর্গ

আমার অশেষ মমতাময়ী মায়ের নামে, যিনি এক কঠিন জীবন সংগ্রামের মাঝে আমাদেরকে তিলে তিলে মানুষ করেছেন অসীম ধৈর্যের সাথে বিপদে-আপদে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম শিক্ষা। তিনি ১লা অক্টোবর ২০০২ সাল আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি চিরতরে চলে গেছেন পরপারে (ইন্না' লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁর বিদেহী রূহের মাগফেরাতের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হলো আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস!

—অনুবাদক

আমাদের কথা

আল্লাহ্ পাকের অপার অনুগ্রহে মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত আলিম, ঐতিহাসিক, বুযুর্গ, রূহানী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) লিখিত ঈমানদীপ্ত কিশোর কাহিনী নামের বইটি প্রকাশিত হলো। যাঁর অশেষ অনুগ্রহে বাংলা ভাষাভাষী কিশোর ভাইবোনদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হলো, সেই মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে জানাই লাখো শোকর ও সজুদ।

আমাদের সকলেরই জানা, আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার যারা আগামী দিনে আমাদের এ সমাজের নেতৃত্ব দেবে। আর এজন্য আমাদের শিশু-কিশোরদের এমনভাবে গড়ে তোলা চাই, যারা হবে ঈমান বলে বলীয়ান, সাহাবা আদর্শে উজ্জীবিত, ইসলামের রঙে রঙীন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা আমাদের সন্তানদের সেভাবে লালন-পালন করতে প্রস্তুত নই, আমরা চাই না আমাদের ছেলেমেয়ে, ভাইবোনেরা ইসলামের আদর্শে উদ্দীপ্ত ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে গড়ে উঠুক!

একটা সমাজ ও দেশ পরিচালনা করতে হলে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই আদর্শ ও সৎ সাহসী মানুষ যে অন্যায়-অনাচারকে প্রশ্রয় দেবে না। আফসোসের বিষয়, পাশ্চাত্য জগতের যে আদর্শ তা দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা আদর্শ মানুষ হতে পারে না।

একজন মা যেমন সন্তান লালন-পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তেমনিভাবে একটা ভাল বই শিশু-কিশোরদের গড়ে তুলতে মায়ের চেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। আর তা যদি হয় নবী-রাসূলদের জীবন কাহিনী, তাহলে তা হবে আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্য। আফসোস! আমাদের দেশে শিশু-কিশোরদের জন্য তেমন কোন ভাল বই লেখা হয় নি যা পড়ে আমাদের শিশুতোষ মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়। যদিও বা কিছু থেকে থাকে, মিথ্যা বানোয়াট কল্প কাহিনী ও ভূতের গল্প ছাড়া আর কিছুই পাই না। আবার এমন কিছু বই আছে যা দিয়ে সুষমভাবে ইসলামবিদ্বেষী মনোভাবসম্পন্ন করে গড়ে তোলার অপপ্রয়াস চলছে। বক্ষ্যমাণ বইটির লেখক জগৎখ্যাত সাহিত্যিক দার্শনিক ও পর্যটক আল্লমা সাইয়েদ আবুল

হাসান আলী নদভী (র.)ও বইটির সফল অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক হোসেন। আমরা অনুবাদককে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

দীর্ঘদিন থেকেই আমরা শিশু-কিশোরদের জন্য কিছু করার ব্যাপারে চিন্তা করছি। সেই চিন্তার প্রতিফল "ঈমানদীপ্ত কিশোর কাহিনী" নামের বইটি। এই জীবন্ত লেখা চিত্র আজকের মুসলিম শিশু-কিশোরদের জন্য অন্তহীন প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করবে এই ভরসাতেই মুহাম্মদ ব্রাদার্সের এ প্রয়াস।

এক্ষণে যেসব শিশু-কিশোরের জন্য বইটি প্রকাশিত হলো তাদের প্রয়োজন পূরণে সামান্যতম সক্ষম হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহর দরবারে একান্ত মুনাজাত, তিনি যেন আমাদের প্রয়াস কবুল করেন এবং নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন! আমীন!!

১৯-১২-০২খ্রী. ঢাকা

–প্রকাশক

অনুবাদকের আরজ

আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। আর শিশু-কিশোর বয়সে অনুকরণ-অনুসরণের ঝোঁকটা খুব বেশী। তাই এ বয়সের পাঠকদের জন্যে চাই সুচিন্তিত পাঠ্যসূচি বা মননশীল সুখপাঠ্য কাহিনী সিরিজ। সম্প্রতি অধিকাংশ আন্তর্জাতিক ভাষায় গড়ে উঠেছে বিশালকায় শিশু সাহিত্য। কিন্তু সে অনুপাতে বাংলা ভাষায় শিশু-কিশোরদের মন-মানস অনুযায়ী নির্মল সাহিত্যের বড়ই অভাব। এ অভাবটা আরো প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয় তখন, যখন দেখা যায়, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকার ঐ কোমলমনা পাঠকদের হাতে তুলে দেয় কাল্পনিক গল্প-কাহিনীর বই-পুস্তক বা জীবজন্তুর অবাস্তব কমিক সিরিজ, যেগুলোর মধ্যে আদর্শ বা শিক্ষা বলতে কিছুই থাকে না, বরং অনেকাংশে শিশু-কিশোররা সে সব অপাঠ্য-কুপাঠ্য বই-পুস্তক পড়ে ছোটকাল থেকেই বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহ, অস্বচ্ছতা-অস্থিরতা ও ভ্রান্তির বিবিধ বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। নবী করীম (সা.) সত্যিই বলেছেন, "প্রত্যেক শিশু স্বভাব ধর্ম (ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে, তার পিতামাতাই তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকরূপে গড়ে তোলে।" সুতরাং প্রচলিত শিশু সাহিত্যে ঈমান ও বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনীমালার এ অভাব নব প্রজন্মের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রকেই তাড়িত করে। আর এ অভাববোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে বক্ষ্যমাণ বইটি বাংলায় রূপান্তরিত করার প্রেরণা।

বইটির মূল লেখক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) হলেন এক কালজয়ী মহামনীষী ও জ্ঞানতাপস। তিনি বড়দের পাশাপাশি শিশু সাহিত্যেরও একজন সফল লেখক। আরবী ভাষায় শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা তাঁর বিভিন্ন বই আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত, বিশেষত তাঁর শিশুতোষ বই 'কাসাসুন নবিয়্যীন' অর্থাৎ নবীদের কাহিনী (পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত) ভারতীয় উপমহাদেশসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। বক্ষ্যমাণ বইটি তাঁর লেখা আরেক উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ বই। ক্বিসাসুন মিনাত্ তারীখীল ইসলামী লিল্ আত্ফাল-এর বাংলা রূপ যা 'ঈমানদীপ্ত কিশোর কাহিনী' নামে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। ছোট্ট পাঠক বন্ধুদের দিকে চেয়ে বইয়ের মূল কাহিনীগুলো

সহজ, সাবলীল ও নির্ভুলভাবে অনুবাদ করার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে।

বইয়ের বাংলা রূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকেরই ভূমিকা আছে। উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন অনেকেই, বিশেষত সম্মানিত প্রকাশক, ভ্রাতৃপ্রতিম জাকির হুসাইন ভাই ও আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন, যিনি নিজের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও বইয়ের পাণ্ডুলিপিসমূহ আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, যেন তিনি এ বইটিকে আমাদের সবার জন্যে পরকালে নাজাতের ওসীলা হিসেবে কবুল করে নেন! আমীন!

বিনীত–

চট্টগ্রাম

তারিখ ঃ ১১. ১১. ০২

মোহাম্মদ সাদিক হোসেন

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অভিমত	১১
ভূমিকা	১৩
আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষক	১৭
ভুখা অতিথি পরায়ণ	২২
এতীমের বিচক্ষণতা	৩২
দুই সহোদরের প্রতিযোগিতা	৩৬
শাহদাতের প্রতি আগ্রহ	৩৯
উহুদের আড়াল হতে	৪৪
ফাঁসির মঞ্চে	৫৭
নিহতের সেই কথায় খুনী হয়ে গেল মুসলমান	৭৩
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে পত্র	৭৭
লাভের বদলে ক্ষতি	৮০
বায়তুল মুক্বাদ্দিসে হযরত উমর (রা.)-এর যাত্রা	৮৫
জিনিসের যথার্থ মূল্যায়ন ও তার পূর্ণ প্রাপ্তি দান	৯০
সময়ের সবচেয়ে বড় শাসকের দুনিয়া বিমুখতা ও আল্লাহভীরুতা	৯৪
আমার নাম উল্লেখের দরকার নেই	৯৮
দয়ালু মুজাহিদ মুসলিম হিরো	১০১
একটি উত্তরে হাজার মানুষের ইসলাম গ্রহণ	১০৫
ক্ষমাকারী ও আপোষকারীর পুরস্কার আল্লাহর কাছে	১১৩
যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে	১১৯

বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক

আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী'র অভিমত

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)-র ঈমানদীপ্ত রচনাবলী ইল্‌ম ও দাওয়াতী ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের জন্যে পথ-প্রদর্শক ও আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তিনি যে যে বিষয়ের ওপর কলম ধরেছেন সবই মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা যে একজন মুজাদ্দিদের অবদান সে কথা পাঠক স্বীকার করতে বাধ্য হন নিঃসন্দেহে।

আল্লামার সাহিত্য রচনাগুলোর মান এতোই উন্নত যে, তা মাদ্রাসা ও ইসলামী ইউনির্ভাসিটিসমূহের পাঠ্যসূচীতে অনেক পুরনো বইয়ের স্থান দখল করে নিয়েছে অথবা স্থান দখল করার যোগ্য। শিশু সাহিত্যে ছোটদের 'কাসাসুন্‌নাবিয়্যীন' (নবী কাহিনী) এক অদ্বিতীয় বই। এর লিখনশৈলীকে আরবরাই পছন্দ করেনি শুধু, বরং তাঁরা তা দেখে রীতিমত অভিভূত ও বিস্মিত। জনৈক আরব কবি ও সাহিত্যিক এক সেমিনারে যখন আল্লামার মুখে শুনলেন, "এ ধরনের তাঁর আরো বই-পুস্তক আছে বা এখনো ছাপার অক্ষরে বের হয়নি।" তখন তিনি অনেকটা আবেগে বলে উঠলেন ঃ

"أين هى ياسو لانا، أعطنا نطبعها بماء الذهب" ـ

'মাওলানা, ঐসব বই কোথায়? আমাদেরকে দিন। আমরা স্বর্ণের পানি দিয়ে সেগুলো ছাপাব।'

আসলে এ সিরিজের বইগুলো স্বর্ণের পানি দিয়ে ছাপানোর উপযুক্ত। সেই সিরিজেরই একটি অংশ বক্ষ্যমাণ বই قصص من التاريخ الاسلا مى للأطفال (যার বাংলা নাম ঈমানদীপ্ত কিশোর কাহিনী)। এ বইয়ে পারিভাষিক সাহিত্য বা বাচনিক সাহিত্য যেমন আছে, যাকে পঠন সাহিত্য বলা হয়, পাশাপাশি তারবিয়তী শিক্ষাও রয়েছে, যাকে অধ্যাত্ম-সাহিত্য বলা উচিত। বইয়ের বিষয় শিরোনামগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ভুখা অতিথিপরায়ণ',

'এতীমের বিচক্ষণতা', 'দুই সহোদরের মধ্যে প্রতিযোগিতা', 'শাহাদতের প্রতি আগ্রহ', 'উহুদের আড়াল হতে', 'ফাঁসির মঞ্চে', 'মুজাহিদ নায়ক' ইত্যাদি। এগুলো এমন সব হৃদয়গ্রাহী কাহিনী ও আমাদের ইতিহাসের এমনও স্বর্ণকণা যা ছোটদের অন্তরে ইসলামী রূহ সঞ্চার ও তাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে খুবই প্রভাব বিস্তারকারী।

স্নেহাস্পদ মাওলানা মোহাম্মদ সাদিক হোসেন সাহেব জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়ার নওজোয়ান ফাজেল ও শিক্ষক, যিনি নদওয়াতুল উলামায় লেখক আল্লামা নদভীর সান্নিধ্য ও নদওয়ার শিক্ষা থেকেও উপকৃত, বাংলা ভাষায় বইটির সুন্দরভাবে অনুবাদ করেছেন। এতে বাংলা পাঠকদের সামনেও ঐ ঈমানদীপ্ত কাহিনীগুলো এসে গেল। সাথে সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বাদ ও মাধুর্যও পাঠকদের অন্তরে অনুভূত হবে নিশ্চয়ই।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, যেভাবে মূল বইকে মকবুল করেছেন এবং তাঁকে সহীহ্ নিয়তের সাথে ব্যাপক উপকারিতার স্বার্থে আরো বেশি করে এ ধরনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন! আমীন!

(আল্লামা) মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী
১৩.২.১৪২৪ হিজরী
ব্যুরো চীপ
আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা, বাংলাদেশ কার্যালয়
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ভূমিকা

শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে একমত, লক্ষ্যভেদী ও প্রাণোদ্দীপ্ত কাহিনীমালা শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র গঠনে ঈমানী ও ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টিতে প্রধান শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, বিশেষত যখন সে সব কাহিনীতে ঈমান, ইয়াক্বীন, ধর্ম ও রিসালাতের রং মিশ্রিত থাকে। এ গল্প কিংবা কাহিনী যদি শিশু-কিশোরদের বুদ্ধি ও বোধশক্তি অনুযায়ী লেখা হয় এবং সে ভাষায় লেখা হয় যে ভাষায় তারা সহজভাবে বোঝে, আত্মস্থ করতে পারে এবং তা হতে রস আস্বাদন করতে পারে, তখন সে সব গল্প-কাহিনী শিশু-কিশোরদের জন্যে শিক্ষা নিকেতনের ভূমিকা পালন করে, যেখান থেকে তারা মনের ওপর কোন ধরনের বোঝা কিংবা কোন ধরনের বিরক্তিবোধ ছাড়াই শিখবে উত্তম ও ভাল-ভাল চরিত্র, মহৎ আদর্শ, অনুপম নৈতিকতা লাভ করবে কোমল মহান সব অনুভূতি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বাণীর চেয়ে সত্য ও সুন্দর কথা আর কার হতে পারে যা তিনি তাঁর কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন ঃ

"তাদের (নবীদের) কাহিনীমালায় বুদ্ধিমানদের জন্যে শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত রয়েছে।" [সূরা ইউসূফ ঃ ২১১]

তিনি তাঁর প্রিয় নবীকে (সা.) সম্বোধন করে বলেন ঃ

"আপনি কাহিনী বর্ণনা করুন, তারা হয়ত চিন্তা করবে।" (অর্থাৎ এখান থেকে চিন্তার খোরাক পাবে)। [সূরা আল আসরাফ ঃ ১৭৬]

সূরা ইউসূফের শুরুতে বলেন, "আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি সেই মতে, যে মতে আপনার নিকট এ কুরআন প্রত্যাদিষ্ট করেছি। আর আপনি ইতোপূর্বে অনবতিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।" [সূরা ইউসূফ ঃ ৩]

সুতরাং অধিকাংশ ভাষা ও সাহিত্যে ধর্ম ও পরিবেশ, শিশু শিক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ ও যাঁরা নব প্রজন্মকে উত্তম চরিত্র, সৌজন্যবোধ, বীরত্ব, নিঃস্বার্থপরতা, আত্মবিসর্জন, সাহসিকতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর আদর্শে গড়ে তুলতে চান, তাঁরা সবাই এমন সব প্রেরণাদায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক কাহিনী সংকলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, যা হবে শিশুদের বয়স ও বুদ্ধি অনুপাতে, তাদের বোধশক্তি ও রসাস্বাদনের ক্ষমতা অনুযায়ী। ফলে এ দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ থেকে গড়ে উঠেছে প্রতিটি জীবন্ত ভাষায় একেকটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী,

যেমনটি গড়ে উঠেছে প্রতিটি সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশে। যে পরিবেশে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি যত্ন নেয়া হয়, নব প্রজন্মকে লালন করতে চায় তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ও আদর্শের ভালবাসার ওপর এবং সেই প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের ওপর, যার ওপর রয়েছে তার গর্ব-অহংকার। সভ্য দুনিয়ার কোন ভাষা শিক্ষিত সমাজের কোন জনগোষ্ঠী এ থেকে ব্যতিক্রম খুব কমই হবে। মুসলিম প্রজন্ম ও মুসলমান শিশুরা অন্যান্য শিশু-কিশোরের চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী প্রাথমিক বয়সে সেসব গল্প-কাহিনীর প্রতি, যা তাদের মধ্যে বীজ বপন করবে শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তম জিনিসকে ভালবাসার। তাদের মধ্যে জন্ম দেবে বীরত্ব ও আত্মবিসর্জন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও শাহাদাতের বাসনা, দুনিয়ার ওপর পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রেরণা, জীবনে অহেতুক ও তুচ্ছ ব্যাপারকে এড়িয়ে চলার মানসিকতা, আল্লাহ্, রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের, তাঁর অনুসারীদের ভালবাসার আগ্রহ এবং তাঁদেরকে ভালবাসার জন্য যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় সর্বাবস্থায় সবর্স্ব কুরবান করে দিয়েছেন, তাঁর দ্বীনের হেফাজত করেছেন এবং মুসলমানদের রক্ষা করেছেন। কারণ মানুষের দুনিয়ার সৌভাগ্য ও সফলতা নিহিত রয়েছে তাদের (শিশু-কিশোরদের) সুস্থ ও কল্যাণকর লালন-পালনের মধ্যে, আল্লাহর রাহে সংগ্রাম ও দাওয়াতের রূহ সঞ্জীবিত হওয়ার মধ্যে এবং মডেল ও আদর্শ জীবনের গুণে অলংকৃত হওয়ার মধ্যে। ইসলামী ইতিহাস হচ্ছে তাবৎ পৃথিবীর গ্রন্থাগার ও ঐতিহাসিক সম্পদরাজির মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ, চারিত্রিক ও ঈমানদীপ্ত উৎকর্ষের দিক দিয়ে এবং সে সব উন্নত মানবিক আদর্শের দিক দিয়ে, যা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সৎ সাহসের প্রতি, মহৎ, শ্রেষ্ঠ উদ্যম ও চেতনার প্রতি। আর ইতিহাসের বিশ্বস্ত গ্রন্থগুলো এ ধরনের গল্প, কাহিনী, নমুনা ও উদাহরণে ভরা। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয়, মুসলিম লেখকরা, মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনালয়গুলো এসব গল্প-কাহিনী সংকলন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। ফলে মুসলমানদের ছেলে-সন্তানরা শিশু ও শিশু-কিশোররা এ বিষয়ে সব সময় স্বল্পতা ও সংকীর্ণতার মধ্যেই বাস করছে। তবে এ ক্ষেত্রে তারা যে একদম দৈন্য ও অভাবের মধ্যে রয়েছে তা আমি বলব না। কিন্তু তারা পেতে পারত এমন কিছু ছোট্ট বই কিংবা পুস্তিকা যেখানে সংকলিত থাকবে ইতিহাসের বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ থেকে কুড়ানো ছোট ছোট গল্প-কাহিনী যা থেকে রচিত হতে পারে মুসলিম শিশু-কিশোরদের জন্যে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার, যেখান থেকে তারা সহজভাবে উপকৃত হতে পারবে, যেখানে তাদের উৎসাহ্-আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং যার নিরন্তর প্রভাব পড়বে শিশু-কিশোরদের অন্তরে, নব প্রজন্মের হৃদয় কন্দরে। আল্লাহ্ তা'আলা লেখকের বক্ষ খুলে দিয়েছেন ইসলামের ইতিহাসের, সীরাত ও জীবনী

গ্রন্থসমূহ থেকে সুন্দর উপকারী, উপাদেয় ও উৎসাহব্যঞ্জক কিছু কিছু কাহিনী সংগ্রহের জন্যে। ইতোপূর্বেও তাঁকে আল্লাহ্ তওফীক দান করেছেন, 'কাসাসুন নবীয়্যীন লিলআতফাল' নামে এক থেকে পাঁচ খণ্ড পর্যন্ত একটি সিরিজ লেখার জন্যে। এ সিরিজটাও শিক্ষাবিদদের পক্ষ থেকে লাভ করেছে ভূয়সী প্রশংসা ও গ্রহণযোগ্যতা। এটা ছিল বর্তমান (বিগত) শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। এর পরেও লেখকের বেশ কয়েকটি ছোট্ট পুস্তিকা বের হয়েছে, যেগুলোর প্রতিটিতে একটি করে কাহিনী রয়েছে। তার পর থেকে লেখক বিভিন্ন দাওয়াতী, শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড ও বড় বড় জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে লেখালেখির কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। কিন্তু এ বিষয়ের সমৃদ্ধি ও এর ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তা তিনি বরাবরই অনুভব করতে থাকেন। অতঃপর এক সময় ইতিহাসের বই-পুস্তক হতে কিছু নতুন বিষয় নির্বাচিত করে সেগুলোকে সহজ ভাষায় ও বোধগম্য পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানো হয়, যাতে সেটা শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি ওদের উপযোগী হয়, যাদের আরবী ভাষা সম্পর্কে একটু-আধটু জ্ঞান আছে এবং সহজ গতিশীল আরবী ভাষা বুঝতে শুরু করেছে। এভাবে নির্বাচিত কাহিনীগুলো একটি পুস্তিকার রূপ ধারণ করে, যাতে আরেকটি কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

লেখকের আশা, এই পবিত্র প্রাথমিক পদক্ষেপটি আরবী ভাষার কলমসৈনিক ও শিক্ষাবিদদের মাঝে মূল্যায়িত হবে এবং ভবিষ্যতে এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে। এ ক্ষেত্রে আরো সংকলন তৈরি হবে, যাতে এ ধরনের কাহিনী অন্তর্ভুক্ত থাকবে যেগুলো হয়ত ভাষা ও স্টাইলের দিক দিয়ে এই পুস্তিকার চেয়ে আরো সুন্দর, শক্তিশালী, আরো অলংকারপূর্ণ হবে। এতে করে লেখক নিয়ত্ সদিচ্ছা ও এই মোবারক যাত্রা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণের সওয়াব পাবেন এবং ইসলামী গ্রন্থাগার জগতকে শিশু-কিশোর বিষয়ক একটি শাখা চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্বলিত উপকারী এক অনন্য সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধকরণের পুণ্য লাভ করবে।

তাঃ ১৮/৬/১১১৪ হিঃ
৬/১/১৯৯১ খ্রী.

সইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
রেক্টর
নদওয়াতুলউলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত
চেয়ারম্যান
আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা

আল্লাহ্ই সর্বোত্তম রক্ষক

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃপুরুষদেরও জন্মস্থান ছিল এই মক্কা। এখানকার বাসিন্দারা মূর্তিপূজা করত এবং যাপন করত এক জাহেলী জীবন। সেই জীবন ছিল আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দ। কারণ সে জীবনে ছিল পৌত্তলিকতা, মূর্খতা, একগুঁয়েমি ও জুলুম-নির্যাতনে ভরা। এমনি এক মুহূর্তে আল্লাহ্তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে তাদের মাঝে প্রেরণ করেন। তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে ওহীর মাধ্যমে আদেশ করলেন যাতে তিনি মানুষদেরকে তাওহীদের দিকে, সত্য ধর্মের দিকে, উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করেন। প্রিয় নবী (সা.) এ সমস্ত ভাল কথা বললে মক্কার বাসিন্দারা বিরোধিতা করে এবং শত্রুতায় মেতে ওঠে, এমন কি পুরো এলাকাটা এ আহ্বান ও আক্বিদা-বিশ্বাস মনোমত হলো না। এ সমস্ত ভাল কথার প্রতি সেখানকার লোকেরা দেখাল প্রচণ্ড দুশমনী ভাব।

এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে মদীনায় হিজরত করার জন্য হুকুম দিলেন। আল্লাহ্র হুকুম পেয়ে তিনি তাঁর একনিষ্ঠ সাথী আবূ বকর (রা.)-কে নিয়ে মক্কা

থেকে মদীনার দিকে গোপনে বের হয়ে গেলেন। সংবাদ পেয়ে মক্কার মুশরিক পৌত্তলিকরা তাঁদের পিছু নেয়। এ দিকে প্রিয় নবী (সা.) ও আবূ বকর (রা.) কিছু দূর গিয়ে মক্কা-মদীনার মাঝপথে অবস্থিত পাহাড়ের 'সওর' নামক একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। আর তাঁদের হেফাযতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে পাঠিয়ে দিলেন একদল মাকড়সা বাহিনীকে। মাকড়সার দল সেখানে গিয়ে গুহা ও তার পার্শ্ববর্তী বৃক্ষের মাঝে বুনে দিল এক ঘন বিস্তৃত জাল। এ জাল গুহায় আশ্রিত প্রিয় নবী (সা.) ও আবূ বকর (রা.)-এর জন্যে আড়াল হিসেবে কাজ দেয়। অন্যদিকে দু'টি বন্য কবুতরকে আল্লাহ্ হুকুম করলেন। ফলে কবুতর দুটো পত পত করে ডানা নেড়ে নেড়ে কোত্থেকে এসে গুহার আশেপাশে উড়তে লাগল এবং তাদের স্বভাব অনুযায়ী বাকবাকুম, বাকবাকুম করে এক সময় গুহার মুখের বৃক্ষের সাথে ঝোলানো মাকড়সার জালে অবস্থান নিল। আর কুরআন সত্যি বলেছে, জমিন ও আকাশ জগতের সমস্ত সৈন্যবাহিনী আল্লাহ্র অধীনে।

এদিকে মুশরিকরা তাঁদেরকে খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখে পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এত কাছে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকালে হয়ত গুহায় আশ্রিতদেরকে দেখে ফেলত। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সে সুযোগ দেননি। ফলে তারা সেখানে এসে দিক্‌ভ্রান্তের মত সমস্যায় পড়ে গেল, মদীনার যাত্রীরা কোথায় হাওয়া হয়ে

গেল? পাশের গুহার মুখে মাকড়সার ঘন জাল দেখে তারা ভাবল, গুহার ভেতরে কেউ ঢুকলে মাকড়সার এখানে থাকার তো কথা নয়! এসব ভেবে ভেবে তারা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে সেখানে আসে। এ দিকে মদীনার যাত্রী প্রিয় নবী (সা.) ও আবূ বকর (রা.) গুহায় চুপচাপ বসে ছিলেন। হঠাৎ এক সময় হযরত আবূ বকর (রা.) মুশরিকদের পদশব্দ শুনে আতংকিত হয়ে বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সর্বনাশ! তারা খুব কাছে এসে গেছে, তাদের কেউ পা তুললেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) তাঁকে অভয় দিলেন এই বলে, তোমার কি ধারণা ঐ দুইজন সম্বন্ধে, যাদের তৃতীয় জন হলেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ বলেছেন, যখন তারা উভয়ে ছিল গুহার ভেতরে। দ্বিতীয় জন তার সাথীকে বলল, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। আর এদিকে তাদের অনুসরণকারী মুশরিকরা কোন দিশা না পেয়ে অবশেষে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। পরে গুহা থেকে বের হয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) নিরাপদে মদীনা পৌঁছে গেলেন। মদীনাকে তিনি বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করলেন। মদীনায় ইসলামের দাওয়াত চারদিকে প্রচারিত হতে লাগলে মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় শান্তির পরশ খুঁজতে থাকে। ফলে মুসলমানদের দল ভারি হয়ে যায়। কিন্তু মক্কার মুশরিক কুরাইশ দলের শত্রুতা মুহূর্তের

জন্যেও থেমে থাকেনি। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে অনেক যুদ্ধও করেছে। মুসলমানরাও বসে থাকেনি। তারা কাফের-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে। অস্ত্রের মোকাবেলা অস্ত্র দিয়ে ও সৈন্যের মোকাবেলা সৈন্য দিয়ে করেছে।

এমনি কোন যুদ্ধ শেষে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) সদলবলে মদীনায় ফিরছিলেন। গ্রীষ্মের দুপুর বেলা। ধূ ধূ মরুভূমি দিয়ে চলছেন সবাই। চারদিকে তপ্ত রোদ। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) পথিমধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছা করলেন। আর মরু অঞ্চলে বৃক্ষ ছাড়া বিশ্রামের কোন স্থানও নেই। তখনকার আরবের মরু অঞ্চলে এক ধরনের কাঁটাযুক্ত (বাবলা) গাছ ছাড়া বড় কোন বৃক্ষও পাওয়া যেত না। অগত্যা কোন নিরাপদ স্থান না পেয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) একটি বাবলা গাছের নীচে অবস্থান নিলেন। নিজের তরবারি টাঙ্গিয়ে রাখলেন গাছের এক ডালে। অন্য সাথীরাও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জন্যে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এবং ছায়াযুক্ত গাছ দেখে শুয়ে পড়লেন। এদিকে রাসূল (সা.)-এরও এক সময় ঘুমে চোখ লেগে আসে। এরই মধ্যে ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা! সবাই যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, এমনই সময় এক কাফের এগিয়ে এল। সে কাছে এসে দেখল, রাসূল (সা.) ঘুমে আর তাঁর তরবারিটা খাপসহ গাছের ডালে টাঙ্গানো। কাফের কি করল, তরবারিটা আস্তে আস্তে ডাল থেকে খুলে নিল এবং

খাপ থেকে ধারালো তরবারি বের করল। ইতোমধ্যে হঠাৎ রাসূল (সা.)-এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে কাফের রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ আপনি আমাকে ভয় করেন?

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বললেন ঃ না। কাফের আবার বলল ঃ আমা হতে আপনাকে কে রক্ষা করবে? আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্।

একথা বলতেই কাফেরের হাত থেকে তরবারিটা নীচে পড়ে গেল। তখন রাসূল (সা.) তরবারিটা হাতে উঠিয়ে নিলেন এবং কাফেরকে বললেনঃ এখন বল আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? কাফের বলল ঃ আপনার কাছে আমি সর্বোত্তম ব্যবহার আশা করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেনঃ তুমি সাক্ষ্য দাও, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল।"

কাফের বলল ঃ না, তবে আমি ওয়াদা করছি, আপনার সাথে কোন দিন যুদ্ধ করব না এবং যারা আপনার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদের সাথেও আমি থাকব না।

তখন রাসূল (সা.) তাকে ছেড়ে দিলেন। পরে সে তার কাফের সাথীদের কাছে এসে বলল ঃ এখন আমি সর্বোত্তম মানুষের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি।[১]

---

১. সহীহাইন ও সহীহ আবী বকর আল ইসমাঈলী হতে সংগৃহীত।

ভুখা অতিথিপরায়ণ

নবী করীম (সা.) মক্কা থেকে ইয়াসরিবে হিজরত করলেন। ইয়াসরিব ছিল মদীনার প্রাচীন নাম। হিজরত করলেন তাঁর অনেক সাথীও। ইয়াসরিবেই সবাই রয়ে গেলেন। মক্কাস্থ তাঁদের ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ, এমন কি ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত তাঁরা ছেড়ে চলে আসলেন। তাঁদের এ ত্যাগ ছিল একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে। তাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) তাঁদের নাম দিলেন মুহাজিরীন।

ইয়াসরিবের মুসলমানরাও এসব ত্যাগী মুহাজিরীনকে সানন্দে বরণ করে নিলেন। তাঁদেরকে জানালেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁদের এ মেহমানদেরকে ঘরে ওঠান, এমন কি তাঁদের ধন-সম্পদ ও অন্যান্য মালিকানাধীন জিনিসপত্রেও তাদেরকে ভাগ দিলেন। অসহায়, ত্যাগী আগন্তুক মুসলমান ভাইদের প্রতি এ অনুপম সাহায্যের কারণে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) তাঁদেরকে নাম দিলেন আনসার।

আনসার ভাইরা মুহাজিরীনদের সামনে নিজের সব কিছু পেশ করলে মুহাজির ভাইরা খুশী হয়ে তাঁদের এই বলে দোয়া দিলেন, মহান আল্লাহ্ আপনাদের মাল-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনে বরকত দান করুন! এ সবের

আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, বরং আপনারা আমাদেরকে এখানকার বাজারটা দেখিয়ে দিন। আমরা সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যবস্থা করে নিতে পারব।

পরে তাই হলো। মুহাজির ভাইরা বাজারে গিয়ে কেনা-বেচা করতে লাগলেন। আল্লাহ্ তাঁদেরকেও খুব দ্রুত ধনী বানিয়ে দিলেন। প্রিয় রাসূল (সা.)-এর আগমনে ইয়াসরিব হয়ে গেল মদীনাতুর রাসূল তথা রাসূলের শহর। এখনও এ শহরকে সবাই মদীনাতুর রাসূল অথবা মদীনা বলেই জানে। এ মদীনাই ছিল মদীনা তথা ইসলামের শহর। তখনকার দুনিয়ার বুকে ইসলামের একমাত্র শহর। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের জন্যে এ মদীনা ছিল হিজরতের কেন্দ্রস্থল। কেউ ইসলাম গ্রহণের পর নিজ এলাকায়, নিজ জাতি দ্বারা নির্যাতিত হলে এ মদীনার দিকেই হিজরত করত। আর এভাবে দুশমনদের নির্যাতন-ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে যেত। সাথে সাথে এ মদীনা ইসলামের একমাত্র মাদ্রাসা বা শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে দ্বীন-এ ইসলাম সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে হয়, তাকে জানতে হয় হালাল-হারাম তথা সিদ্ধ-নিষিদ্ধ বিষয়াদি, শিখতে হয় ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান। অনুরূপ মুসলমান হলে কুরআন শেখাও জরুরী। অবশ্য করণীয় বিষয়ের মত তাকেও শিখে নিতে হয় ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান। সালাত কিভাবে আদায় করবে, রোজা কিভাবে রাখবে?

আর প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া সালাত, রোজা ইত্যাদি পালন কোন নব দীক্ষিত মুসলমানের জন্যে সুদূরপরাহত। এই জ্ঞান না থাকলে কিভাবেই বা ইসলামী জীবন যাপন করবে, তাই দ্বীন ইসলামের এসব জরুরী বিষয় শেখা খুব প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় যাবে এ দ্বীন শেখার জন্য? মক্কায়? না তায়েফে? সেখানেও না, ওসব জায়গায় কেউ দ্বীনের শিক্ষা দেয় না। মদীনাতুর রাসূলই ছিল ইসলামের শিক্ষাকেন্দ্র॥ পৃথিবীর একমাত্র ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। দ্বীন শিখতে হলে সেখানে না গিয়ে উপায় নেই যার ফলে মদীনা পরিণত হয় মুসলমানদের হৃদয় পুণ্যস্থানে। আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে নবদীক্ষিত মুসলমানরা দলে দলে মদীনা আসতে থাকে। মদীনায় আগত এসব মুসলমানের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন এমন, যাঁরা ইসলাম গ্রহণের দায়ে নিজ এলাকায় নিপীড়নের শিকার হন। অবশেষে সেখান থেকে মদীনায় পালিয়ে আসেন। আবার কেউ কেউ আসতেন দ্বীনী বিষয় শেখার জন্যে। এঁরা সবাই ছিলেন ইসলামের মেহমান। এঁরা মদীনায় আসতেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) তাঁদেরকে পেয়ে খুব খুশী হতেন। আনন্দের সাথে তাঁদেরকে জানাতেন শুভেচ্ছা-স্বাগতম। যেহেতু এঁরা আল্লাহ্, রাসূল (সা.) ও ইসলামের মেহমান হয়ে আসতেন সেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে যথাযথ খানাপিনার মাধ্যমে সম্মান করতে চাইতেন, কিন্তু রাসূল (সা.) তো একজন জগৎবিরাগী

মানুষ! এক বেলা খেলে আরেক বেলা না খেয়ে কাটাতে হতো। খাওয়ার পর আল্লাহ্‌র শোকর করতেন। ভুখা অবস্থায় সবর করতেন। অনেক দিন তো রাসূল (সা.)-এর ঘরের চুলায় আগুন পর্যন্ত জ্বলত না, পাক হতো না কোন খানা। তারপরেও মেহমান ভুখা থাকুক সেটা তিনি (সা.) পছন্দ করতেন না। যেহেতু তাঁরা আল্লাহ্‌র মেহমান, তাঁর রাসূলের মেহমান, সর্বোপরি ইসলামের মেহমান। এক সময় তিনি (সা.) ইরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।"

মদীনার মুসলমানরা এক পরিবারের লোকের মত মিলে-মিশে থাকতেন। পুরো মদীনাই যেন একটি ঘর! আর তাঁরা সবাই সে ঘরের বাসিন্দা। মদীনায় যখন বাইরের মুসলমানরা মেহমান হয়ে আসতেন, তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তাঁরা নিজ নিজ মেহমানকে ঘরে নিয়ে সাধ্য মতো আপ্যায়ন করতেন, আগন্তুক মেহমানরাও বিনা দ্বিধায় মুসলমানদের ঘরে গিয়ে দাওয়াত গ্রহণ করতেন। রাত যাপন করতেন। তাঁদের মনে হতো যেন তাঁরা সবাই একই ঘরের মেহমান! তাঁরা যেখানেই যান, যেখানেই থাকুন, তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর মেহমানই!

এই মদীনাবাসী আনসারদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে খুব

ভালবাসতেন। রাসূল (সা.)-ও তাঁকে ভালবাসতেন। ইনি ছিলেন হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা.)। হযরত আবূ তালহার একটা ছায়া-ঢাকা পাখি-ডাকা বাগান ছিল। বাগানের পানি ছিল ঠাণ্ডা সুপেয়। রাসূল (সা.) মাঝে-মধ্যে তাঁর বাগানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। সেখানে বিশ্রাম করতেন। সেখানকার ঠাণ্ডা পানি পান করতেন। একদা রাসূল (সা.) তাঁর প্রিয় সাহাবী আবূ বকর (রা.)-সহ আবূ তালহার বাগানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আবূ তালহা (রা.) তখন বাগানে ছিলেন না। প্রিয় নবী (সা.) প্রিয় সাথীকে নিয়ে পানি পান করলেন এবং সেখানে আরাম করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে আবূ তালহা (রা.) এসে উপস্থিত হন। নিজ বাগানে দু'জন মেহমান পেয়ে তিনি তো মহাখুশী! তাও আবার আল্লাহ্ রাসূল (সা.) ও তাঁর প্রিয় সাথী আবূ বকর (রা.)। আবূ তালহা (রা.) দ্রুত বের হয়ে গেলেন মেহমানদের সম্মানে ছাগল যবেহ করার জন্যে। রাসূল (সা.) তাঁকে ডেকে বললেনঃ দেখো, কোন বাচ্চার মা কিংবা দুগ্ধধারিণী ছাগল যবেহ করো না।

আবূ তাল্হা (রা.) চলে গেলেন। ছাগল যবেহ করে মেহমানদের জন্যে পাক করে নিয়ে আসলেন। উভয় মেহমান খানাপিনা শেষ করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করেন। আসার সময় আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আবূ তালহা (রা.)-এর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন।

একদা মদীনায় আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর নিকট কয়েকজন মেহমান এলেন। অন্যবারের মত সেবারও তিনি

(সা.) মেহমানদেরকে মুসলমানদের মাঝে ভাগ করে দিলেন। মুসলমানরা নিজ নিজ ভাগের মেহমানদের সানন্দে বরণ করে নিলেন। আবূ তালহা (রা.)-ও নিজ ভাগের মেহমানদেরকে পেয়ে যারপর-নাই আনন্দিত হন। কারণ তাঁরা আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) ও ইসলামের মেহমান। আবূ তালহার আনন্দ এজন্যে, যেহেতু তিনি এঁদের মেহমানদারির মধ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি ও আখেরাতে অনেক পুণ্যের আশা করতেন।

আবূ তালহা (রা.) মেহমানদেরকে নিয়ে নিজ বাড়ী অভিমুখে চললেন, কিন্তু বাড়ী গিয়ে মেহমানদের উপযোগী খানপিনা আছে কিনা সেটা আবূ তালহার জানা ছিল না। তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম আদৌ খানা পাকিয়েছেন কিনা অথবা মেহমানদের জন্য অতিরিক্ত খানা রয়েছে কিনা তা তিনি জানতেন না। তাঁর কচিকাঁচা সন্তানরা তখন পর্যন্ত খানা খেয়ে শুয়ে পড়েছিল, নাকি তখনও খানার অপেক্ষায় জেগে রয়েছে, এসব কিছুরই তাঁর খবর নেই। কিন্তু আবূ তালহা (রা.) এসব বিষয় নিয়ে কোনই মাথা ঘামালেন না। কোন দুশ্চিন্তাই তাঁর পথে বাধ সাধল না, বরং আবূ তালহা (রা.) খুশি মনে রাস্তা অতিক্রম করতে লাগলেন মেহমানদেরকে নিয়ে। বাড়ীর সামনে এসে ঘরের দরজায় তিনি করাঘাত করলেন এবং 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন, "আমি আসতে পারি?"

ভেতর থেকে আওয়াজ এল ঃ ওয়া আলাইকা আসসালাম, আসুন। আবূ তাল্‌হা (রা.) সুসংবাদের সুরে স্ত্রীকে বললেন ঃ আমার সাথে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর মেহমান আছেন। স্ত্রী উম্মে সুলাইম (রা.)-ও অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলে উঠলেন ঃ 'স্বাগতম' আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর মেহমানদেরকে।

আবূ তালহা (রা.) বললেন ঃ ঘরে কোনো খাদ্য আছে ?

উম্মে সুলাইম (রা.) নির্ভয়ে নিঃসংকোচে উত্তর দিলেনঃ শুধু বাচ্চাদের খাদ্য আছে। তখন আবূ তালহা (রা.) ভাবতে লাগলেন, উপস্থিত খাদ্য তো ঘরওয়ালাদের জন্যও যথেষ্ট নয়, মেহমানদের জন্য কি করা যায়? আবূ তালহা চিন্তায় ডুবে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা মহৎ কৌশল এল। আসলে ভাল মানুষদের মহৎ কৌশলের অভাব থাকে না।

আবূ তালহা সেই রাতে না খেয়ে মেহমানদেরকে খাওয়ানোর মনস্থ করলেন। স্ত্রী উম্মে সুলাইমও একই ইচ্ছা পোষণ করলেন। তাঁরা ভাবলেন, মেহমানদেরকে সম্মান করতে গিয়ে একটি রাত ভুখা থাকলে তেমন কী অসুবিধা হবে! এক রাত না খেলে তো আর তাঁরা মরে যাবেন না? এভাবে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী সেই রাতে মেহমানদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধ্যন্য দেবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন এবং

উভয়ে পরামর্শ করলেন, বাচ্চারা যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন মেহমানদের খাওয়ানো হবে। কিন্তু হঠাৎ আবার প্রশ্ন জাগল, মেহমানরা খাবেন আর সাথে ঘরের মানুষ মেজবান খাবে না, এটা কি করে হয় ? সে ব্যাপারে হযরত আবূ তালহা (রা.) ভাবতে লাগলেন। অবশেষে তারও একটা সিদ্ধান্ত তিনি পেয়ে গেলেন। স্ত্রী উম্মে সুলাইমকে ডেকে বললেন ঃ আমি মেহমানদেরকে নিয়ে যখন দস্তরখানায় যাব, তখন তুমি বাতি ঠিক করার বাহানায় কাছে গিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিও। পরে তাই হলো। মেহমানরা খাওয়ার জন্যে বসলেন। আবূ তালহাও তাঁদের সাথে বসেন। ইতোমধ্যে উম্মে সুলাইম পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আস্তে আস্তে বাতির কাছে গেলেন এবং এমন ভাব দেখালেন যেন বাতি ঠিক করছেন। এক সময় বাতি নিভিয়ে দিলেন। বাতি নিভে গেল। মেহমান অন্ধকারেই খেতে লাগলেন। আবূ তালহাও খানার পাত্রের দিকে হাত বাড়ান আর ওঠান, কিন্তু শূন্য হাতই ওঠাতেন। তিনি মেহমানদের সামনে জিহ্বা মুখ নেড়ে ভাব দেখালেন যেন তিনিও তাঁদের সাথে খাচ্ছেন, অথচ তিনি কিছুই খাচ্ছেন না বাস্তবে। মেহমানরা তাঁর খানায় সন্দেহও করলেন না। সন্দেহ কেন হবে? কেউ কি রাতের খানা ছাড়ে ? রাতে কি কেউ উপোস থাকে? এর মধ্যে মেহমানরা খানার পর্ব শেষ করলেন একদম দ্বিধাহীন মনে। খানা খেয়ে ভালভাবে

তৃপ্ত হলেন এবং মনে করলেন, আবূ তালহাও তাঁদের মতো খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন। আসলে কিন্তু আবূ তালহা একটি গ্রাসও মুখে ওঠান নি। রাতের অন্ধকারই তাঁকে এতে সাহায্য করেছে। এ দিকে মেহমানরা দস্তরখানা থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে আল্লাহ্‌র হামদ॥প্রশংসা করলেন এবং তাঁদের অতিথিপরায়ণ মেজবানের জন্য বরকতের দোয়া করেন। আবূ তালহাও তাঁদের সাথে সাথে উঠে হাত-মুখ ধুলেন এবং মেহমানদের আরামের ব্যবস্থা করে দিলেন। মেহমানরা শুয়ে পড়লেন এবং রাত কাটালেন পরিতৃপ্ত অবস্থায়। আর আবূ তালহার রাত কাটল উপোস অবস্থায়, কিন্তু এর পরেও আবূ তালহা ছিলেন ভীষণ খুশী বরং অন্যান্য রাতের তুলনায় সে রাত খুশী মনে বেশী বেশী আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

পরদিন সকালে স্বভাব অনুযায়ী আবূ তালহা (রা.) রাসূল (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হন। সেই দিন তিনি খুব নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত ছিলেন। মনেই হচ্ছিল না যে, তিনি পুরো রাত উপোসে কাটিয়েছেন! আবূ তালহা (রা.) মনে মনে ভেবেছিলেন, এ রাতের কাহিনী একমাত্র তিনি আর তাঁর সহধর্মিণী উম্মে সুলাইম ছাড়া কেউ জানতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা জানতেন। সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ করেন। যেখানে বলেছেন, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের ওপর অন্যদেরকে

প্রাধান্য দেয়। তখন রাসূল (সা.) আবূ তালহাকে রাতের ঘটনা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি কাহিনীটি শোনালেন। শুনে আবূ তালহার প্রতি খুশী হলেন। তাঁর এ ত্যাগ, এ উদারতা, এ মহানুভবতার দরুন এ কাহিনী আজো অনন্য হয়ে রইল তাফসীর ও ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

এতীমের বিচক্ষণতা

ইসলামের নবী আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব যখন হচ্ছিল তখন মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশ মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। যে খানায়ে কাবাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ঈসমাইল (আ.) নির্মাণ করেছিলেন একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্যে, সেখানে সে কাবায় তারা বসিয়েছিল ৩৬০টি মূর্তি এবং সেগুলোরই পূজা চলত আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘরে। এমনি এক পরিবেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটল। তিনি (সা.) আদেশ প্রাপ্ত হয়ে মক্কার জনগণকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বান করলেন। তিনি যখন জনসমক্ষে ঘোষণা করলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"ঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। মূর্তিপূজক কুরাইশ বংশীয় লোকেরা চটে গেল। তাদের রচিত মাবুদের বিরুদ্ধে বলতেই তারা রাগে ক্ষোভে ক্ষেপে গেল। তারা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-কে কষ্ট দিতে লাগল। নানাভাবে জুলুম করতে লাগল নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) সব কিছু সহ্য করেছেন ধৈর্যের সাথে। অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার

পরিচয় দিয়েছেন মুসলমানরাও। সব ধরনের জুলুম, কষ্ট ও নির্যাতনের মুখে তাঁরা ছিলেন অবিচল ।

কিন্তু কুরাইশরা অন্য লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বাধা দিত। তারা মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত পর্যন্ত করতে দিত না। এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা.)-কে হিজরতের অনুমতি দেন। ফলে রাসূলল্লাহ্ (সা.) মদীনায় হিজরত করেন। দল দলে মুসলমানরাও হিজরত করলেন মদীনার দিকে। কারণ মদীনা ছিল তুলনামূলকভাবে ইসলামের সবচেয়ে উপযোগী স্থান। সেখানকার বাসিন্দারা ছিল কোমল ও বিনয়ী। হিজরতের পূর্বেই তাদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানকার অধিবাস গ্রহণ করেন, তখন তিনি সেখানে একটা মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলেন। কারণ মসজিদ মুসলমানদের এক অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয় তাঁদের সামগ্রিক ইসলামী জীবন ব্যবস্থা।

প্রিয় নবী (সা.) মদীনায় উঠেছিলেন আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর ঘরেই। তাঁর ঘরে প্রিয় নবী (সা.) বেশ ক'দিন মেহমান ছিলেন। মেহমান থাকা অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর ঘরের পাশেই একটা খোলা

জায়গা রয়েছে। লোকেরা সেটা সময়ে সময়ে খেজুর রাখার অথবা উট বাঁধার স্থান হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) সেখানেই মসজিদ নির্মাণের মনস্থ করেন। সুতরাং তিনি এলাকাবাসীর কাছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ খোলা স্থানটা কার মালিকানাধীন ? আনসারদের মধ্যে থেকে মাআজ ইবনে আফরা নামক জনৈক সাহাবী বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.), দুইজন এতীমই ও জায়গাটার মালিক। তাদের একজনের নাম সাহল এবং আরেক জনের নাম সুহাইল।

রাসূল (সা.) সাহল ও সুহাইলকে ডেকে পাঠালেন। তারা যখন উপস্থিত হলো রাসূল (সা.) দেখলেন, আসলেই তারা দুইজন কচি কচি এতীম ছেলে। মালিক হিসেবে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) সে খোলা জায়গাটার ও তার মূল্যের ব্যাপারে তাদের সাথে আলাপ করেন।

সাহল ও সুহাইল উভয়ে এক বাক্যে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা আমরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দিয়ে দিলাম। এর বিনিময়ে আমরা কোন মূল্য চাই না। আপনি সেখানে মসজিদে নির্মাণ কাজ শুরু করে দিন। এতেই আমাদের আত্মা খুশী হবে।

কিন্তু রাসূল (সা.) বিনা মূল্যে নিলেন না। জায়গাটা তাদের কাছ থেকে কিনেই নিলেন এবং তার মূল্য তাদেরকে পরিশোধ করলেন।

মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। রাসূল (সা.) সে কাজে অংশ নেন। নিজের হাতে মাটির ঢেলা, কাঁচা ইট এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে জনৈক মুসলমান বলে ওঠেন ঃ

'আমরা বসে থাকব আর নবীজী কাজ করবেন,

তাহলে তো আমাদের পণ্ডশ্রম হবে।'

আনসার মুহাজির সমস্ত মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করছিলেন, আর ক্ষণে ক্ষণে সুরে সুরে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করছিলেন, "হে মহান আল্লাহ্‌, আসল জীবন তো পরকালীন জীবন, করুন আনসার মুহাজিরে আপনি রহমতের বারি বর্ষণ।"

মসজিদ তৈরি হয়ে গেল। এটাই সেই ঐতিহাসিক মসজিদে নববী। আমিরুল মুমেনীন উসমান (রা.) ও পরবর্তী আরো কয়েকজন মুসলিম শাসকের হাতে এ মসজিদে নববী ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে যুগ যুগান্তর ধরে। এখন তো মসজিদে নববী এমন বড় ও প্রশস্ত হয়ে গেছে যে, হাজার হাজার মুসল্লি এক সাথে সেখানে সালাত আদায় করতে পারেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সবাইকে সেই পবিত্র মসজিদটি দেখার এবং সেখানে সালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন!

দুই সহোদরের প্রতিযোগিতা

বদরের যুদ্ধ ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আমাদের প্রিয়নবী (সা.) তিন শ' তেরো জন সাহাবী নিয়ে মুশরিক কুরাঈশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কাফের বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজারেরও বেশী। ইসলামের দুশমন আবূ জাহাল তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রে তুলনামূলক বেশী হওয়ায় কাফেরদের দাম্ভিক মনোভাব ছিল লক্ষণীয় আর মুসলমানরা সংখ্যা ও সরঞ্জামে দুর্বল হলেও তারা ছিল ঈমানী বলে বলীয়ান। আল্লাহ্‌র সাহায্যের ওপর ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস। কারণ তারা আল্লাহ্‌রই সৈনিক। তাঁরই কালেমা বুলন্দ করার জন্যে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে। এখানে আনসার মুহাজিরদের মধ্যে বড় বড় সাহাবীর সাথে অনেক ছোট ছোট সাহাবীও এসেছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করার মানসে। এসেছিলেন একই পরিবারের একাধিক সদস্যও। অনেক পিতা-পুত্র ও সহোদররাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন এ যুদ্ধে প্রিয় রাসূলের নেতৃত্বে।

এক সময় যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। শুরু হয়ে যায় সত্য-মিথ্যার, হক-বাতিলের লড়াই। এ ভয়াবহ যুদ্ধমুখর মুহূর্তে একটি চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) তিনি বলেন ঃ

বদরের যুদ্ধের দিন আমি এক জায়গায় লক্ষ্য স্থির করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার ডানে ও বামে ছিল আনসারের দুই সহোদর বালক মাআজ ইবনে আফরা ও মুআব্বিজ ইবনে আফরা। যুদ্ধের এক সময় তাদের একজন আমার একদম কাছে এসে অপর ভাই না জানে এমনভাবে গোপনে জিজ্ঞেস করল ঃ

চাচাজান! আপনি আবূ জাহালকে চেনেন ?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, কিন্তু ভাতিজা, তুমি তাকে দিয়ে কি করবে? উত্তর দিল, আমি শুনেছি, সে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-কে গালি দেয়। আমাকে একটু তাকে দেখিয়ে দিন না চাচাজান। আমি আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছি, যদি তাকে পাই তাকে ছাড়ব না; হয় তাকে মেরে ফেলব, না হয় তার সাথে লড়তে লড়তে আমি শহীদ হব।

হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, দ্বিতীয় ভাইও একটু পরে তার ভাই থেকে তেমনি চুপ করে কানে কানে বলল ঃ চাচাজান, আবূ জাহালকে আমাকে একটু দেখিয়ে দিন তো! আমি আল্লাহ্‌কে কথা দিয়েছি, তাকে দেখামাত্র

আমার এ তরবারি দিয়ে আঘাত করব এবং তাকে হত্যা করেই আমি ক্ষান্ত হব।

হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন ঃ আমি লাগাতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এক সময় হঠাৎ সামনে আবূ জাহালকে দেখামাত্র আমার ডান-বাম পাশের উভয় সহোদরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম ঃ এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ! এই তো আবূ জাহাল। এ তো তোমাদের লক্ষ্য।

সাহাবী বলেন ঃ বলার সাথে সাথে তারা উভয়ে ঈগল পাখীর মতো আবূ জাহালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নাঙ্গা তরবারির উপর্যুপরি আঘাতে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। অতঃপর তারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে তাদের এ বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কথা বলল।

রাসূল (সা.) তাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছ? তারা উভয়ে একই সাথে বলে উঠল ঃ আমি তাকে হত্যা করেছি।

তিনি (সা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের রক্তাক্ত তরবারি মুছে ফেলেছ? তারা উত্তর দিল ঃ না।

তখন নবী করীম(সা.) তাদের রক্তাক্ত তরবারির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ।

শাহাদাতের প্রতি আগ্রহ

সেই অনেক দিন আগের কথা। যখন আমাদের রাসূল (সা.) মুশরিক-কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বদর প্রান্তে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অন্য মুসলমান মুজাহিদদের সাথে উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস নামের এক বালকও গিয়েছিল সেখানে। তার বয়স ছিল ষোল বছর। তার ইচ্ছা সেও যুদ্ধ করবে।

উমাইরের ভয় হচ্ছিল, হযরত রাসূল (সা.) তাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেবেন না। কারণ সে ছোট। তাই সে ভীষণভাবে চেষ্টা করছিল, নিজেকে আড়ালে রাখার যাতে কেউ তাকে না দেখে! সে বারে বারে লুকাচ্ছিল, কিন্তু তার বড় ভাই সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হঠাৎ তাকে দেখে ফেলেন। তিনি বললেন, এই ছোট ভাই! কি ব্যাপার, তুমি কার থেকে লুকাচ্ছ? উমাইর বলল ঃ আমার ভয় হয়, ছোট হওয়ার কারণে রাসূল (সা.) আমাকে রণাঙ্গন থেকে ফেরত না দেন, অথচ যুদ্ধে যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছা আমার। আমাকেও হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা শাহাদাত দান করবেন।

উমাইরের যা আশংকা ছিল, অবশেষে তাই হলো। রাসূল (সা.) তাকে দেখে ফেলেন। দেখলেন সে ছোট। আর যুদ্ধ ছোটদের কাজ নয়! তারা সেখানে কি করবে, বড়দের পর্যন্ত যেখানে হিমশিম খেতে হয়।

কিন্তু উমাইরের ফিরে যেতে মন চাচ্ছিল না। ঘরে বসে থাকা, বন্ধু-বান্ধবের সাথে মদীনার অলি-গলিতে খেলা করা ইত্যাদি কিছুই ভাল লাগছিল না তার। সে চাচ্ছিল আল্লাহ্‌র রাহে শহীদ হতে। তবে আবার উমাইর এও চাচ্ছিল না, সে রাসূল (সা.)-এর অবাধ্য হয়ে জিদ করে অবস্থান করুক। কারণ তার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করা। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর অবাধ্য হয়ে তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করা তো যায় না! এ অবস্থায় উমাইর সমস্যায় পড়ে গেল। তার দুঃখ, সে যুদ্ধের বয়সে উপনীত হয় নি। কিন্তু সে তো শাহাদাত প্রত্যাশী, সেতো আল্লাহ্‌র পথে মরতে চায়, জান্নাত পেতে চায়। আর জান্নাত সে কাছেই দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু সে পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছবে উমাইর? তার যুদ্ধের বয়স হয়নি।

উমাইর বিরাট সমস্যায় পড়ে গেল। তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। সে ছোট। তার মনও ছোট। এক সময় সে কেঁদে ফেলে। উমাইরের কান্না দেখে রাসূলের (সা.)-এর মন গলে গেল। তিনি (সা.) উমাইরকে অনুমতি দিয়ে ফেলেন। কারণ আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) ছিলেন বড় কোমল হৃদয়ের অধিকারী।

নবী (সা.) যখনই উমাইরকে অনুমতি দিলেন উমাইর অবর্ণনীয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে গেল। এমন খুশি হলো যেন জান্নাতের ছাড়পত্র পেয়ে গেল সে!

উমাইর তার বড় ভাই ওর অন্য মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে বের হলো। তারা সবাই বড় বড় ও শক্তিশালী পুরুষ। উমাইর ছিল ছোট।

অবশেষে উমাইরের আশা পূর্ণ হলো। সে বদর যুদ্ধে শহীদ হলো। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক থেকেও সে অগ্রগামী হয়ে গেল।

মহান আল্লাহ্ উমাইরের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন!

একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন উহুদের দিকে বের হলেন কুরাইশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্যে, তখন তাঁর সাথে মদীনার কয়েকজন ছোট ছেলেও বের হয়েছিল। তাদের ইচ্ছা, তারাও আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করবে, অথচ তারা ছিল ছোট। তাদের কারো বয়স পনের বছরের বেশী ছিল না। ছোট হওয়ার কারণে রাসূল (সা.) তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। কেননা তাদের বয়স কম। যুদ্ধের ময়দানে গেলে তারা বড়দের সমস্যায় ফেলবে। অন্যান্য সরঞ্জামের মত তাদেরকেও দেখাশোনা করতে হবে।

সেই ছেলেদের মধ্যে রাফে বিন খদিজ নামে এক ছেলে ছিল। তার বয়স ছিল পনের বছরেরও কম। তার যুদ্ধ করার এতই স্বাদ ছিল যে, আঙ্গুলের ওপর ভর করে কৃত্রিম উপায়ে লম্বা হওয়ার চেষ্টা করছিল যাতে লোকেরা তাকে দেখে বড় মনে করে, তারও যুদ্ধে যাওয়ার বয়স হয়েছে। কিন্তু রাসূল (সা.) তাকে দেখে বুঝতে পারলেন,

সে ছোট। লম্বা হওয়ার অপচেষ্টা করছে। অতএব, তাকে ফেরত দেন। তাকে ফেরত দিতে দেখে তার পিতা রাসূল (সা.)-এর নিকট সুপারিশ করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ছেলে রাফেকে যুদ্ধের জন্য অনুমতি দিন। সে ভাল তীর চালাতে পারে। ফলে রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে অনুমতি দেন। অনুমতি পেয়ে রাফে যারপর-নাই খুশী হলো। অন্য মুজাহিদদের সাথে যখন সে রণাঙ্গন অভিমুখে যাচ্ছিল তখন ছোট ছোট ছেলে যেভাবে ঈদের দিন নতুন পোশাক পরে অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও খুশী মনে ঈদগাহের দিকে যায়, তাদের চাইতেও বেশী হাসিখুশী মনে হচ্ছিল তাকে।

ছোট হওয়ার কারণে যাদেরকে রাসূল (সা.) ফেরত দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আরেকটি ছেলে ছিল, যার নাম সামুরাহ বিন জুনদুব। সেও রাফের সমবয়সী। রাফেকে অনুমতি দিতে দেখে সে বলে উঠল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি রাফেকে অনুমতি দিয়েছেন আর আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, অথচ সে আমার সাথে কুস্তি লড়লে আমি তাকে পরাজিত করতে পারব। এ কথা শুনে রাসূল (সা.) সামুরাহ ও রাফেকে হুকুম দিলেন পরস্পরে কুস্তি লড়ার জন্যে। দেখা গেল, সামুরাহ যেমন বলেছিল, সত্যি সে রাফেকে ধরাশায়ী করেছে। ফলে সেও মুজাহিদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে অনুমতি পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেল!

তাই রাসূল (সা.) সামুরাহকেও যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে অনুমতি দিলেন। সামুরাহ মহানন্দে সেদিন উহুদ যুদ্ধে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধও করেছিল সে।

মহান আল্লাহ্ রাফে ও সামুরাহ উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আর আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন!

উহুদের আড়াল হতে

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশে বদর প্রান্তরের দিকে যখন বের হয়েছিলেন তখন অনেক মুসলমানও তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিন শ' তেরো জনের মত। আবার বেশ কিছু মুসলমান হুজুর (সা.)-এর এই যুদ্ধাভিযান সম্বন্ধে জানতই না! কারণ তখন কোন কোন মুসলমান উট চরাতে চলে গিয়েছিলেন, কেউ গিয়েছিলেন ক্ষেতে পানি দিতে, কেউ বাগান পাহারা দিতে, কেউ কেউ বা দোকান খুলতে। মোট কথা যেহেতু তারা কাজের মানুষ ছিলেন সংগ্রামী, তাই সেদিনও তারা নিজ নিজ কাজে বেরিয়েছিলেন। তারা জানতেন না, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের দিকে যাচ্ছিলেন নাকি অন্য কোথাও।

সেদিন অন্যদের মত আনাস বিন নাযারও ব্যক্তিগত কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে আজই বদর প্রান্তরের দিকে বের হয়ে যাবেন সেটা তিনি জানতেন না। জানলে তিনি কখনও আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-কে ছেড়ে যেতেন না। সেদিন তাঁর মজলিস ছেড়েও কোথাও যেতেন না। কারণ তিনি আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহান্বিত। আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

যা হোক, আল্লাহ্তাআলা বদর যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন। আল্লাহ্র সাহায্যে মুসলমানরা মুশরিকদেরকে শোচনীয়- ভাবে পরাজিত করেন। আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে ধারাবাহিক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছেন। সে যুদ্ধে মুসলমানরা সত্তরজন মুশরিককে হত্যা করেন। অপর সত্তরজনকে তাঁরা বন্দী করেন, যেখানে তাদের হাতে আবূ জাহল ইবনে হেশাম, ওতবা ইবনে রাবেয়া, ওয়ালীদ শায়বার মত বড় বড় মুশরিক নেতা পর্যন্ত নিহত হয়েছিল। বদরের দিন ছিল সত্য-মিথ্যার মধ্যে এক চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। সেদিনটি ছিল কাফেরদের জন্য বড়ই কঠিন। মহান আল্লাহ্ বদরী সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন! মাগফিরাত আর মহাদানে তাঁদের পুরস্কৃত করুন!

আনাস ইবনে নজর যখন জানতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, তাঁর সাথে মুসলমানরা গিয়েছিল এবং কাফের-মুশরিকদের সাথে জিহাদ করেছে, যখন জানতে পারলেন, বদরের দিন ছিল সত্য-মিথ্যার মধ্যে ফয়সালার দিন, কারা শয়তানের বন্ধু আর কারা রহমান আল্লাহ্র বন্ধু সেই দিন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই বদরের দিনেই মুসলমানদের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে, আর মুশরিকদের চেহারা হয়েছে ধুলোয় ধূসরিত, তখন আনাস এ রকম একটি সুবর্ণ মুহূর্ত

হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় খুব বেশি অনুতপ্ত হলেন। অনুতপ্ত, দুঃখ- ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.), আপনি যে মুশরিকদের সাথে প্রথম যুদ্ধ করেছেন তাতে তো আমি অংশ নিতে পারিনি। আল্লাহ্ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ দেন, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই দেখবেন আমি কি পরিমাণ শৌর্য-বীর্য দেখাই সেদিন। আনাস কথাগুলো বলছিলেন এমন স্বর যার মধ্যে দুঃখ ছিল, সাহসও ছিল। তাঁর কথার স্বর ও ভঙ্গিমা থেকে আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ ভরসা ও ঈমানের স্পষ্ট আভা প্রকাশ পাচ্ছিল।

আল্লাহ্‌র কিছু কিছু ঈমানদার বান্দা এমন আছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র নামে কোন শপথ নিলে আল্লাহ্ তাদের সেই শপথ অবশ্যই পূর্ণ করেন। তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে কোন কথা বললে আল্লাহ্ তাঁদের কথা সত্যে পরিণত করেন। সুতরাং আনাস সেদিনের প্রতীক্ষায় রইলেন যেদিন স্বীয় উদ্বেল আত্মা প্রশান্ত করতে এবং তার মাধ্যমে নিজ প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। আনাসের পরবর্তী সময় খুব কষ্টে কাটতে লাগল। খানাপিনা তাঁর কিছুই ভাল লাগছিল না। বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে থেকেও তিনি কোন শান্তি পাচ্ছিলেন না। এদিকে মুশরিকরা বদর প্রান্তর হতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে মক্কায় যখন ফিরছিল, সারা দুনিয়া তাদের চোখে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ভূ-পৃষ্ঠ

অতি প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে সংকীর্ণ দেখাচ্ছিল। কারণ সে যুদ্ধে তাদের সত্তরজন নিহত এবং অপর সত্তরজন বন্দী হয়েছে। প্রতিপক্ষ মুসলমানদের হাতে বদরের বিস্ময়কর পরাজয়ের দরুন তারা লজ্জায় মাথা ওঠাতে পারছিল না। লোকেরা কি বলবে কুরাইশদের সম্পর্কে? যখন তারা জানতে পারবে, মাত্র তিন শ' তেরো জন পুরুষ কুরাইশের অশ্বারোহী সৈনিককে পরাজিত করেছে, কী আশ্চর্য! তারা কি বলবে না, যুগ যুগ ধরে সেনা কুরাইশের সেই বাহাদুরী কোথায় গেল? কোথায় গেল তাদের সাহসিকতা, বীরত্ব ও সম্মান? ফলাফল তাই হলো। খুব দ্রুত এই খবর দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। প্রচারিত হলো এক গোত্র থেকে আরেক গোত্রে। লোকেরা মজলিসে আসরে এ বিষয় নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। আর বদরের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কিভাবেই বা মানুষের কাছে লুক্কায়িত থাকবে ? কিভাবে গোপন থাকতে পারে গোত্রসমূহে আবূ জাহল ও উতবার হত্যার খবর ?

এখন প্রশ্ন দেখা দিল ঃ কুরাইশ দলের লোকেরা আগামী হজ্জ মৌসুমে আগত লোকদের কিভাবে মুখ দেখাবে? কি নিয়ে তারা মিনায় অপরের ওপর গর্ব করবে? আর যে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাথীরা গেল কয়দিন আগে তাদের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে, সে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাথীদের সম্পর্কে এবার কি বলবে? আগে তো অনেক কিছু বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করত!

কুরাইশ এ সব সংকট উত্তরণের জন্য সংকল্প ব্যক্ত করল। সংকল্প ব্যক্ত করল, তারা বদরের প্রতিশোধ নেবে। বদরের দিন পরাজয়ের যে দাগ তাদের ললাটে লেগেছে, তারা সে দাগ অবশ্যই ধুয়ে মুছে ফেলবে। এটাই এর একমাত্র সমাধান। এটাই এখন তাদের করণীয় কাজ।

প্রতিশোধ ও হিংসায় মক্কা থেকে মুশরিকদের বের হবার খবর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি সাহাবীদের একত্র করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের কি রায়? আমরা কি মদীনায় অবস্থান করেই তাদের সাথে যুদ্ধ করব, নাকি মদীনা থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করব? বয়োজ্যেষ্ঠদের রায় ছিল, মুসলমানরা মদীনা অবস্থান করেই মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অভিপ্রায়ও ছিল তাই। কারণ সেটাই ছিল তখনকার জন্য যথার্থ, কিন্তু যুবকরা ইচ্ছা প্রকাশ করল, মুসলমানরা মদীনা থেকে বাইরে গিয়ে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবে যাতে করে তাদের বীরত্ব ও সাহসিকত বাইরের জগতে খুব বেশী প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এদের রায়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনা থেকে বের হলেন।

পথিমধ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাই বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে আলাদা হয়ে সটকে পড়ল। তার রায়

ছিল, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) মদীনা থেকে বের না হওয়ার পক্ষে। সে বলল- আপনি আমার বিরোধিতা করেন আর অন্যের কথা শোনেন? এভাবে মুসলমানদের সংখ্যা হয়ে গেল সাত শ'। এর মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ জন ছিল ঘোড়সওয়ার।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়র (রা.)-কে তীরান্দাজদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তাদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। আবদুল্লাহ তাঁর সাথীদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাদের কেন্দ্রস্থল আঁকড়ে ধরে থাকে। কোন অবস্থাতেই যেন তারা সেখান থেকে উঠে না যায়, এমন কি তারা যদি পাখীকে দেখে মুসলিম বাহিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে, তবুও নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তীরন্দাজদের হুকুম দিয়েছিলেন, মুশরিকদের তীর নিক্ষেপ করতে যাতে তারা পেছনের দিক দিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে।

এ যুদ্ধে রাসূল (সা.) ঝাণ্ডাবাহী বানালেন মুসআব ইবনে ওমায়র (রা.)-কে এবং স্বীয় তরবারি হস্তান্তর করলেন আবূ দুজানা (রা.)-কে। তিনি ছিলেন একজন বড় বাহাদুর বীর পুরুষ। এক সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। চলতে লাগল হক বাতিলের এক তুমুল লড়াই। দিনের প্রথমে যুদ্ধের পাল্লা মুসলমানদের পক্ষে এবং কাফেরদের বিপক্ষে ছিল। আল্লাহ্‌র দুশমনরা পরাজিত হয়ে

পশ্চাদ্‌পসরণ করল। পেছনে হঠতে হঠতে তারা তাদের মহিলাদের অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু হায় আফসোস! তীরন্দাজ সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ স্মরণ রাখে নি। তারা নিজেদের রায়ের ওপর আমল করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের নির্ধারিত স্থানে অটল থাকতে। কোন অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ না করতে, এমন কি মুসলিম বাহিনীকে যদি পাখিরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, তবুও না। তারা যদি তাই করত, নিজেদের স্থানে অটল থাকত, তা তাদের জন্য কতই না উত্তম হতো! কিন্তু এ রকম তো হয়নি।

সুতরাং তীরন্দাজরা যখন দিনের প্রথম প্রহরে কাফেরদের পরাজয় দেখল, তখন তারা নিজেদের নির্ধারিত স্থান ছেড়ে দিল যাকে রক্ষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা পরস্পরে বলল ঃ হে লোক সকল! চল মালে গনীমত সংগ্রহ করি।

অথচ সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়র (রা.) তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.)-এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ হে আমার সাথীরা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদেরকে কি বলেন নি, তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট স্থান আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে, তা থেকে

কখনো হঠবে না, এমন কি পাখিরা যদি তোমাদের বাহিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তবুও না? কিন্তু আবদুল্লাহ্‌র সাথীরা তাঁর কথা শুনল না। তারা ধারণা করেছিল, মুশারিকরা পরাজিত হয়েই গেছে। তারা আর ফিরবে না। অতএব, আমরা কেন আমাদের স্থানে বসে থাকব?

ঐ দেখ, আমাদের অন্য সাথীরা মালে গনীমাত নিচ্ছে তবে আমরা কেন তা হাতছাড়া করব? কারণ যুদ্ধ তো নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে! মুশরিকরাও চলে গেছে। তাদের ফেরার আর কোন আশংকা নেই। এর পরেও এখানে বসে থাকার অর্থ কি? নিশ্চয় রাসূলল্লাহ্ (সা.)-এর ইচ্ছাও তা ছিল না। রাসূলল্লাহ্ (সা.) অবশ্যই সেই আদেশ দেননি। তারা চলে গেল। সীমান্ত প্রহরায় রয়ে গেলেন শুধু আবদুল্লাহ্ (রা.)। আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবদুল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হোন! তাঁর সাথীদের ক্ষমা করুন!

এদিকে মুশরিকদের মধ্যে যারা ঘোড়সওয়ার ছিল, তারা পুনরায় আক্রমণ চালাল। দেখল, ঐ সীমান্ত এলাকাটা খালি, এখানকার জন্য নির্দিষ্ট তীরন্দাজরা নেই। ফলে ওদিক দিয়ে তারা রণাঙ্গনে ঢুকে পড়ল। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া মুশরিক বাহিনী আবার একত্র হয়ে গেল। পাল্টে গেল যুদ্ধের গতি।

হযরত আবূদল্লাহ (রা.) শহীদ হয়ে গেলেন। শহীদ হয়ে গেলেন আরো যাঁরা তাঁর সাথে ওখানে ছিলেন।

মোটের ওপর সত্তর জন সাহাবী শহীদ হন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সবাইকে শাহাদাত দান করে সম্মানিত করলেন।

অন্যান্য মুসলমানও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবীদের একটি জামাত স্থির ছিলেন। মুশরিকরা হামলা করতে করতে এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তাঁর চেহারা মুবারক আহত হল। মুশরিকরা শহীদ করে দিল তাঁর সামনের দাঁত। তারা ভেঙ্গে দিল প্রিয় নবী (সা.)-এর শিরাস্ত্রাণ। তাঁকে পাথর মারল। ফলে এক সময় তিনি একটি গর্তে পড়ে যান।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) রাসূলুল্লাহ্র (সা.)-এর হাত ধরলেন আর তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ (রা.) তাঁকে কোলে করে ওঠালেন। কাফেরদের আঘাতে লৌহ শিরাস্ত্রাণের দুইটি কড়া রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর চেহারা মুবারকে ঢুকে গিয়েছিল। হযরত আবূ উবায়দা (রা.) সেগুলো ধরে টান দিলেন। সামনের দাঁত বসিয়ে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এতে তাঁর সামনের দু'টি দাঁতই পড়ে গেল। আহা! কী মুবারক দাঁত। কী মূল্যবান দাঁত দু'টি রাসূলকে বাঁচাতে তারা শহীদ হলো। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেনঃ লৌহ শিরস্ত্রাণের একটি কড়া রাসূলুল্লাহ্র (সা.)-এর গালে একদম ঢুকে গেছে। সেটা টেনে বের

করার জন্য আমি সামনে অগ্রসর হলাম। এতে আবূ উবায়দা (রা.) বলে উঠলেন! হে আবূ বকর! তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম! যদি তুমি আমাকে এর সুযোগ না দাও। ফলে তিনি তা বের করতে গেলেন। তাতে তাঁর সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। আবূ বকর (রা.) বলেন ঃ দ্বিতীয়টা বের করার জন্য আমি আগে বাড়লাম। আবূ উবায়দা বলল ঃ হে আবূ বকর! তোমাকে আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তুমি আমাকে এর সুযোগ না দাও। তিনি বলেন, ফলে আবূ উবায়দা তাঁর মুখ দিয়ে সেই অংশটাও গ্রহণ করলেন। এতে তাঁর সামনের আরেকটি দাঁত পড়ে গেল। মালিক ইবনে সিনান (রা.) দৌড়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে প্রবাহিত রক্তগুলো চুষে নেন। তাঁকে বলা হলো, কুলি করে ফেল। তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি তা কখনও ফেলব না।

মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে বাড়ল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খারাপ। কিন্তু আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দারা তাদের সেই উদ্দেশ্য হাসিল হতে দিলেন না। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর নিকট ছুটে এসেছিলেন দশজন সাহসী সাহাবী। প্রিয় রাসূল (সা.)-কে বাঁচাতে গিয়ে একে একে তাঁরা সবাই শহীদ হলেন। কেউ বেঁচে রইলেন না। সাহাবী আবূ দুজানা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বাঁচাতে স্বীয় পৃষ্ঠকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। দুশমনের তীর এসে তাঁর পৃষ্ঠে বিঁধত, অথচ তিনি বিন্দুমাত্রও নড়তেন না। অনুরূপ

সাহাবী তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) স্বীয় হাতকে ঢাল বানালেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেফাজতের জন্য। তীর এসে বিঁধতে বিঁধতে এক সময় তা অবশ হয়ে যায়। কী বিস্ময়কর রাসূল (সা.)-প্রেম! আর প্রিয়তম রাসূল (সা.)-এর হেফাজতে উৎসর্গীকৃত কতই না সম্মানিত সেই পৃষ্ঠ ও সেই হাত! এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর চড়তে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না দুর্বলতার দরুন, আহত হওয়ার দরুন। সেই দৃশ্য দেখে হযরত তালহা (রা.) বসে গেলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর ওপর আরোহণ করে পাথরের ওপর চড়লেন। আহা! কী বরকতময় সেই সওয়ারী আর কী মহান সেই আরোহী!

এ যুদ্ধে মহিলা সাহাবী উম্মে আম্মারা (রা.) ভীষণ সাহসের সাথে অংশ নিয়েছিলেন। কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন কাফেরদের সাথে। তিনি তরবারি দিয়ে বেশ কয়েকটি আঘাত করেছিলেন আমর ইবনে কোমাইআকে। আল্লাহ্র এ দুশমনও তাঁকে তরবারির আঘাত করে। এতে তিনি খুব বেশি আহত হন।

এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাতজন আনসার আর দু'জন কুরাইশ সাহাবীকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় মুশরিকরা আক্রমণ করে বসল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ যে এদেরকে প্রতিহত করবে তার জন্য জান্নাত। এটা শুনে একজন আনসারী সামনে বাড়লেন এবং মুশরিকদের সাথে মোকাবেলা করতে করতে শহীদ হয়ে

গেলেন। মুশরিকরা আবার আক্রমণ চালাল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ এদেরকে যে আমার থেকে প্রতিহত করবে তার জন্য জান্নাত এবং সে জান্নাতে আমার সাথী হবে। এটা শুনে আরেক আনসার সাহাবী ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। এভাবে শত্রুদের আক্রমণ হতে লাগল, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পাশের আনসারী সাহাবীদের উদ্দেশে আহ্বান করতেন ঃ যে এদেরকে আমার থেকে প্রতিহত করবে তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত। এভাবে একের পর এক প্রিয়তম নবীকে রক্ষার সংগ্রামে লড়তে লড়তে পাশে অবস্থানরত সাতজন আনসারী সাহাবীই শহীদ হয়ে গেলেন। এদিকে হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.) ছিলেন একদম দৃঢ়। বললেন ঃ হে আল্লাহ্! এরা অর্থাৎ মুসলমানরা যা করেছে তার জন্য আমি তোমার দরবারে অপারগতা পেশ করছি। আর এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে তার থেকে আমি নিজেকে তোমার কাছে নির্দোষ প্রকাশ করছি। অতঃপর হযরত আনাস (রা.) মুসলমানদের একটি দলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তারা অস্ত্র ফেলে হাত গুটিয়ে বসে আছে। তিনি (রা.) বললেন ঃ তোমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছ? তারা উত্তর দিল ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) শাহাদাত বরণ করেছেন।

তিনি বললেন ঃ তিনি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর তোমরা জীবন দিয়ে কি করবে? ওঠ, যেজন্য তিনি (সা.) জীবন

দান করেছেন, তোমরাও সে পথে জীবন উৎসর্গ করে দাও। এমতাবস্থায় হযরত সায়াদ ইবনে মুআয (রা.)-এর সাথে হযরত আনাসের সাক্ষাত হয়ে গেল। বললেন ঃ, হে সা'দ, আমিতো ওহুদ পাহাড়ের ঐ প্রান্ত হতে জান্নাতের সুগন্ধি অনুভব করছি।

অতএব, হযরত আনাস (রা.) অগ্রসর হলেন জান্নাতের দিকে। সামনেই যেন জান্নাত দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি এবং যারা তাঁর প্রত্যাশিত জান্নাতের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল তাদের সাথে মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছিলেন। লড়তে লড়তে এক সময় তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। তাঁর মুবারক দেহখানা যখন জমিনে পড়েছিল তখন তাঁর শরীরে আশিটির চেয়েও বেশী মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন ছিল। কিছু বর্শার, কিছু তরবারির, আর কিছু আঘাত তীরের। মুসলমানরা যখন তাঁর সন্ধান পেল, দেখল, মুশরিকরা তাঁর দেহ আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, এমন কি প্রথমে তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি। একমাত্র তাঁর বোন আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন।১

আল্লাহ্‌র অসংখ্য রহমত নাযিল হোক তোমার ওপর, হে আনাস! বীর পুরুষদের এমনি হওয়া উচিত। এ রকমই হওয়া উচিত বীর সৈনিকদের।

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম ও যা'দুল মা'আদ।

ফাঁসির মঞ্চে

রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর সাহাবীগণ ছিলেন আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা। তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের ইবাদত করতেন। ব্যস্ত থাকতেন ব্যবসা-বাণিজ্যে, চাষাবাদে, বিভিন্ন কারিগরি পেশায়, যেমন কাপড় বোনায়, সেলাইয়ের কাজ করা, কামারশালায়, কাঠ মিস্ত্রিগিরি, চামড়া শিল্পে ইত্যাদি। সুতরাং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সদা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন, কেউ জ্ঞান অন্বেষণ করতেন, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ চাষী, আবার কেউ কেউ কারিগর। তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই মুসলমান। কেউ আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর কেউ পরে।

তাঁরা অন্য দশ জন মানুষের মতই খাওয়া-দাওয়া করতেন। কথা বলতেন, হাসতেন। বাজারে বেচা-কেনা করতেন। জমি চাষ করতেন। কারখানায় কাজ করতেন, কিন্তু সবই ছিল আল্লাহ্‌র পথে। কারণ তাঁরা সব কিছুতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তালাশ করতেন। তাঁরা আপন প্রভুর ইবাদত করতেন যেহেতু তাঁদেরকে এজন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।"

তাঁরা ইলম-জ্ঞান অন্বেষণ করতেন। যেহেতু তাঁরা (আল্লাহ্‌র বাণী) শুনেছেন, "(উপমাগুলো) কেবল

আলেম-জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে।" আরো শুনেছেন, "আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করেন।"

তাঁরা ব্যবসা, চাষাবাদ ও কারিগরি পেশায় ব্যস্ত থাকতেন, কারণ তাঁরা আল্লাহ্‌র কালাম শুনেছেন, "যখন সালাত শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ কর।" কিন্তু যখন তাঁরা কোন আহ্বানকারীকে এ আহ্বান করতে শুনতেন, বেরিয়ে পড় আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং বলতে শুনতেন কাউকে ঃ চল সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা সমস্ত আকাশ ও জমিনসম। তখন তাঁরা পরিত্যাগ করতেন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ ও সকল কারিগরি পেশা এবং বেরিয়ে পড়তেন আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করার জন্যে। ত্যাগ করতেন পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ঘর-বাড়ী, এমন কি দেশ পর্যন্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন আল্লাহ্‌র পথে। এ রকম কেন করবেন না তাঁরা? তাঁরাই তো শুনেছেন তাঁদের নবী (সা.)-কে বলতে, 'আল্লাহ্‌র রাহে এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া, দুনিয়ার ভেতর যা আছে, সব কিছুর চাইতে উত্তম।'

তাঁর মুখেই তো শুনেছেন, 'সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে রয়েছে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! আমার ইচ্ছা জাগে, আমি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করি, যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হই, আবার যুদ্ধ করি, শহীদ হই, আবার যুদ্ধ করি,

আবার শহীদ হই'।

তাঁর মুখ থেকে আরো শুনেছেন,

"নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়াতলে" এবং "তোমাদের কারো আল্লাহ্‌র রাস্তায় অবস্থান করা, তার ঘরে সত্তর বছর নামায পড়ার চেয়ে শ্রেয়।"

একদিন নবী করিম (সা.) মুসলমানদের একটি দলকে শত্রু এলাকায় প্রেরণ করার ইচ্ছা করলেন মুশরিকদের খবর জানার জন্যে। তিনি জানতেন, সেটা শত্রু এলাকা এবং মুশরিকরা সব সময় ওঁৎ পেতে বসে থাকে। সুতরাং তিনি এমন দশজন লোক নির্বাচিত করলেন যাঁদের নিকট জীবনের কোন মায়া নেই। তাঁরা মৃত্যু ভয় করেন না। আসেম ইবনে সাবিত আনসারী (রা.)-কে তাঁদের আমির বানিয়ে দিলেন। তাঁরা সবাই নিজ নিজ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততিও বন্ধু-বান্ধবদের বিদায় জানালেন কারণ তাঁরা জানতেন, তাঁরা শত্রু এলাকার দিকে বের হচ্ছেন। আর মুশরিকরা ওঁৎ পেতে বসে আছে।

তাঁরা তাঁদের পরিবার, ছেলে-সন্তানের, বন্ধু-বান্ধবদের বললেন, 'বিদায় হে প্রিয়জনেরা! রোজ কেয়ামতে আবার দেখা হবে। এই বলে তাঁরা মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌র পথে চলতে চলতে এক সময় তাঁরা 'হুদআহ নামক স্থানে পৌঁছলেন। এ স্থান ছিল মক্কা ও উসফানের মাঝামাঝি।

এদিকে এক লোক পার্শ্ববর্তী গোত্র বনী লাহ্য়ানের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল ঃ আরে তোমরা জান হুদআহতে একদল মুসলমান এসেছে! গোত্রের লোকেরা বলল: আল্লাহ্র কসম, আমরা জানি না। তাদের কোন খবর আমাদের কাছে নেই।

লোকটি বলল, আল্লাহ্র কসম, তারা হুদআহতেই আছে। আমি তাদের দেখেছি। শপথ করে বলছি, আমার চোখেই দেখেছি এবং তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করার জন্যে ছুটে এসেছি যাতে তাদের ব্যাপারে তোমরা ব্যবস্থা নাও। তারা বলল, তোমার মঙ্গল হোক, হে অমুক গোত্রের ভাই! ওরা কয় জন?

সে বলল, মনে হয় ওরা দশ জনের চেয়ে বেশি হবে না। তারা বলল ঃ তা হলে তাদের জন্যে একশ' পুরুষের দরকার। কারণ তাদের প্রত্যেকেই দশজনের সমান। তোমরা কি শোন নি তাঁদের রবের বাণী

"হে মুমিনগণ! তোমাদের যদি বিশজন ধৈর্যশীল হয় তবে তারা দু'শ' জনের ওপর বিজয় লাভ করবে। আর যদি হয় ধৈর্যশীল একশ' জন, তাহলে তারা এক হাজার কাফেরের ওপর জয়ী হবে। এটা এজন্যেই, যেহেতু তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।"

তোমরা কি দেখো নি, কিভাবে তারা অতীতে (বদর যুদ্ধে) মাত্র তিনশ' তেরো জন হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের

গোটা বাহিনীকে পরাজিত করেছে, হত্যা করেছে, আমাদের সর্দার নেতাদেরকে।

আল্লাহ্ কসম! কুরাইশ সর্দার আবূ ইকরেমার কথা আমরা ভুলব না। ভুলব না আবূল ওয়ালীদ ও তার বীর সন্তানের কথা।

হে বদরের নিহত ব্যক্তিগণ! আমাদের কাঁধে তোমাদের কতই না অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে!

ওঠ হে ভাইসব, আমরা বদরের প্রতিশোধ নেব। অতঃপর বনী লাহইয়ানের একশ' পুরুষ দাঁড়াল এবং বলল ঃ চল আমাদের শত্রুদের দিকে, হুদআহর দিকে, সেখানে আমরা বদর যুদ্ধের বদলা নেব। এ বলে তারা ছুটে চলল। লোকজনের কাছে এই দশ জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল। হে লোকেরা! তোমরা কি ইয়াসরিবের কিছু মানুষ দেখেছ? তোমরা কি এমন কাউকে দেখেছ যে সালাত আদায় করে?

ওরা মরুভূমির বালিতে সাহাবীদের পথের চিহ্ন দেখে দেখে চলল, চিহ্ন ধরে ধরেই এক সময় তাঁদের সন্ধান পেয়ে গেল এবং খুব খুশী হলো।

হযরত আসেম (রা.) ও অন্যান্য সাহাবী যখন ওদেরকে দেখলেন, দ্রুত একটি স্থানে আশ্রয় নিলেন। কাফেররা তাদেরকে ঘিরে ফেলল। অতঃপর তারা বলল,

তোমরা সবাই নেমে এসো। আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রইল, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না।

কিন্তু হযরত আসেম (রা.) জানতেন, কাফেরের প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই। আমানতদারী ও ওয়াদা রক্ষার কোন মূল্য নেই ওদের কাছে। কাফেরকে কোন কিছুই বিশ্বাসঘাতকতা হতে বিরত রাখে না। তিনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আল্লাহ্ কাফের-মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন, "তারা মর্যাদা দেয় না, কোন মুমিনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। তিনি আরো বলেন, এদের কোন শপথ নেই।"

এ কাফেররাই তো অতীতে নবী করিম (সা.)-এর কাছে এসে বলেছিল, কুরআন হাদীস শিক্ষা দিতে পারে এ রকম কিছু লোক আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। সুতরাং তিনি তাদের কাছে সত্তর জন আনসার সাহাবীকে প্রেরণ করলেন যাদেরকে কুররা অর্থাৎ কুরআনের ক্বারী বলা হতো। কিন্তু কাফেররা পথিমধ্যে তাঁদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বেই তাঁদেরকে শহীদ করেছিল।

হযরত আসেম (রা.) এসব ভাল করেই জানতেন। তাই কোন কাফিরের ওপর তাঁর আস্থা ছিল না এবং কারো দ্বারা তিনি প্রতারিত হতেন না। সুতরাং তিনি এসব কাফেরের ওপর আস্থা রাখতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ

আল্লাহ্ ও আখেরাতের ওপর যাদের বিশ্বাস নেই, কিসে তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বাধা দান করবে এবং কোন জিনিস তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্যে উৎসাহিত করবে। হযরত আসেম (রা.) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তো কোন কাফেরের অঙ্গীকারের ওপর অবতরণ করব না। হে আল্লাহ্! তোমার নবী (সা.)-কে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে দাও।

মুশরিকরা ক্রুদ্ধ হলো এবং মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। তীর মেরে তারা হযরত আসেম (রা.)-কে ও সাথে সাথে আরো ছয় জনকে শহীদ করে দিল। আল্লাহ্ তাআলা হযরত আসেম (রা.)-কে শাহাদাত দান করে সম্মানিত করেন। তিনি তো একমাত্র আল্লাহ্র নিরাপত্তায় ছিলেন। সুতরাং তাঁর জন্যে ছায়ার ন্যায় একদল মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। এ মৌমাছি দল তাঁর হেফাজত করেছিল। তাঁর পবিত্র দেহ পাহারা দিচ্ছিল। হযরত আসেম (রা.) কুরাইশের জনৈক নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তারা এ ঘটনা জানতে পেরে এক লোককে পাঠিয়েছিল তাঁর শরীরের কিছু অংশ কেটে আনার জন্য, যাতে তারা নিশ্চিত হতে পারে, হযরত আসেম (রা.) সত্যিই নিহত হয়েছেন।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা চাইলেন না, তারা হযরত আসেম (রা.)-এর শরীর স্পর্শ করুক! কেননা তিনি তো আল্লাহ্রই নিরাপত্তায় রয়েছেন। কোন কাফেরের নিরাপত্তা

দানের অঙ্গীকারে অবতরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সুতরাং কাফেররা এসে দেখল, মৌমাছির দল হযরত আসেম (রা.)-কে পাহারা দিচ্ছে। তারা ভয় পেয়ে গেল। হযরত আসেম পর্যন্ত পৌঁছার তারা কোন সুযোগ পেল না এবং পারল না তার শরীরের কোন অংশ কেটে নিতে। ফলে বিফল হয়ে ফিরে গেল।

সঙ্গীরা দেখল, হযরত আসেম (রা.) শহীদ হয়ে গেছেন। কাফেররা সবাইকে এভাবে শহীদ করে ফেললে মুশরিকদের খবরাখবর কে জানবে! কে বা তাদের অবস্থা সম্পর্কে নবী করীম (সা.)-কে ওয়াকিবহাল করবে?

নবী করীম (সা.) তো তাঁদেরকে মুশরিকদের খবরাখবর জানার জন্যেই পাঠিয়েছিলেন।

আসেম (রা.) চেষ্টা করেছেন, তিনি সওয়াব পাবেন। তাঁর সঙ্গীরাও চেষ্টা করেছেন। তাঁরাও সওয়াব পাবেন। প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চেয়েছেন এবং প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ্ তাআলা কল্যাণের ওয়াদা করেছেন।

অতএব, তিনজন সাহাবী কাফেরদের অঙ্গীকার ও চুক্তির ওপর পাহাড় থেকে অবতরণ করলেন। তাঁরা হলেন হযরত খুবায়ব (রা.), যায়েদ ইবনে দাছিনা (রা.) ও আরেকজন সাহাবী।

মুশরিকরা যখন এই তিনজনকে নিজেদের আয়ত্তে আনল তখন ধনুকের তারগুলো খুলে তাঁদেরকে বাঁধতে

লাগল। তখন তৃতীয় জন বলে উঠলেন, এই তো প্রথম গাদ্দারী! আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের সাথে যাব না। নিহত সাথীদের দিকে ইশারা করে বললেন, নিশ্চয় আমার জন্যে এঁদের মধ্যে আদর্শ রয়েছে।

কাফেররা তাঁকে খুব টানা-হেঁচড়া করল। তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি অনড়। এক সময় তাঁকেও তারা শহীদ করে ফেলল।

অতঃপর কাফেররা হযরত খুবায়ব (রা.) ও যায়েদ ইবনে দাছিনা (রা.)-কে মক্কায় এনে বিক্রি করে দিল।

হযরত খুবায়ব (রা.) বদর যুদ্ধের দিন হারিস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। হারিসের সন্তানরা যখন শুনল তাদের পিতৃহন্তা খুবায়ব বনী লাহয়ানের নিকট বন্দী, তখন তারা সেখানে ছুটে গেল এবং খুবায়ব (রা.)-কে ক্রয় করে নিল যাতে পিতৃহত্যার বদলায় তাকে হত্যা করতে পারে।

হযরত খুবায়র (রা.) বনী হারেসের কাছে বন্দী অবস্থায় রইলেন, জানেন না কখন তাঁকে শহীদ করা হবে। তবে শহীদ তো অবশ্যই করা হবে।

সুতরাং তিনি একটু পাক-পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা করলেন, রবের সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিতে চাইলেন। দরকারী কাজ সারবার জন্য একটি ক্ষুর ধার নিলেন।

এ অবস্থায় হারেসের জনৈকা মেয়ের একটি ছোট্ট শিশু হাঁটাহাঁটি করতে করতে এক সময় হযরত খুবায়বের নিকট

চলে আসে। শিশুর মা সেদিকে খেয়াল করেনি। শিশুরা তো আর শত্রু-মিত্র চেনে না!

এদিকে হযরত খুবায়বও নিজ বাচ্চাদের কাছে থেকে পৃথক হয়েছেন আজ অনেক দিন গত হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন উদার ও কোমল অন্তর বিশিষ্ট, অত্যন্ত মেহেরবান। আর মুমিন মাত্রই ভদ্র, উদার, মার্জিত রুচিসম্পন্ন হয়ে থাকে। সে দুর্বলদের ওপর রহম করে ; ছোট্টদের স্নেহ করে। মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে না, কঠোর হয় না। নবী করীম (সা.)-ও ছিলেন অত্যন্ত হৃদয়বান ও কোমল অন্তরের অধিকারী। তিনি ছোট্ট শিশুদের ভালবাসতেন, তাদের চুমু খেতেন।

সুতরাং হযরত খুবায়ব (রা.) শিশুটিকে পেয়ে খুব খুশী হলেন এবং তাকে স্বীয় উরুর ওপর বসালেন। ক্ষুরটা তখন তাঁর হাতেই ছিল। শিশুর মা যখন সেদিকে দৃষ্টি ফেরাল, দেখল, তাঁর বাচ্চা খুবায়েবের কোলের ওপর। মহিলাটি খুব ভয় পেয়ে গেল। চিৎকার করে বলে উঠল, হায় হায়, কী ভয়ানক দৃশ্য! যে শত্রুকে আগামীকালই হত্যা করা হবে তার কোলে আমার বাচ্চাটি! শত্রুর হাতে রয়েছে ধারালো ক্ষুর। শত্রুর জন্য সুবর্ণ সুযোগ বাচ্চাকে হত্যা করে স্বীয় আত্মাকে শান্তি দেয়ার।

বেচারী মহিলা! মুমিন ব্যক্তিকে চেনেনি। মুমিনের ওয়াদা রক্ষা, উদারতা, মহানুভবতা ও সহৃদয়তা সম্পর্কে

তার কোন ধারণাই নেই। সে জানে না, শিশুদেরকে হত্যা করার, নারীদের ওপর, বৃদ্ধদের ওপর আক্রমণ করার অনুমতি তো মুমিন ব্যক্তির নেই, তাঁর উদারতা ও তাঁর শরীয়ত যুদ্ধের ময়দানেও এর অনুমতি দেয় না, ঘরের মধ্যে তো অনেক দূরের কথা!

হযরত খুবায়ব (রা.) মহিলার খুব ভীতি-আতংক লক্ষ্য করে বললেন, তোমার কি ভয় হচ্ছে আমি একে হত্যা করব! আরে, আমি এ কাজ কখনও করব না

এভাবে হযরত যুবায়র (রা.) বনী হারিসের নিকট বন্দী হয়ে রইলেন। এমন দুশমনের নিকট বন্দী, যাদের পিতাকে তিনি অতীতে হত্যা করেছেন। তারাও আগামীকাল তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। হারেসের সন্তানরা হযরত খুবায়বকে কোনমতে বাঁচিয়ে রাখার মত খাবার দিত। কারণ তিনি মরে গেলে ওরা তাঁকে কিভাবে হত্যা করবে? কিভাবে তাদের মনের জ্বালা মেটাবে? কিন্তু হযরত খুবায়ব (রা.) ছিলেন আল্লাহ্‌র মেহমান। তিনি কি তাঁর পথে ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজনও খানাপিনা সব কিছু ত্যাগ করেন নি? সুতরাং তাঁর পালনকর্তাই তাঁকে খাওয়াতেন, পান করাতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাজের মূল্যায়নকারী, সব কিছু জানেন।

হযরত যুবায়ব (রা.) তো অনুভূতি ও জড় জগত থেকে আত্মা ও অদৃশ্য জগতে প্রত্যাবর্তন করে গেছেন তাঁর রবের সাক্ষাতের আশায়। প্রতি মুহূর্তে শাহাদাতের

অপেক্ষায় রয়েছেন। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। বেরিয়ে গেছেন দুনিয়ার প্রভাব থেকে। ফলে তাঁর নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জান্নাতের উপঢৌকন আসত। এ ছিল মহান দয়ালু ক্ষমাশীল রবের পক্ষ থেকে আপ্যায়ন স্বরূপ। তাঁর ঘটনা ছিল ইমরান তনয়া হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনার ন্যায় যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে, "হযরত জাকারিয়া (আ.) যখনই মেহরাবে তাঁর মারইয়াম কাছে যেত, তাঁর নিকট খাবার পেত। জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে মারইয়াম, তোমার এ খাবার কোত্থেকে? তিনি বললেন ঃ এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন।"

হযরত খুবায়বের (রা.)-এর কাছে অসময়ে ফলমূল আসত। কেউ জানত না, তাঁর নিকট এসব ফলমূল কোথা থেকে আসে? অথচ তিনি তো লোহার শিকলে বন্দী! হারেসের ওই কন্যাটি বলেছে, "আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুবায়রের চেয়ে উত্তম কোন বন্দী দেখিনি। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, একদিন আমি তাঁকে এ অবস্থায় পেলাম যে, সে হাতে এক থোকা আঙ্গুর নিয়ে খাচ্ছে, অথচ সে লোহার শিকলে বন্দী এবং তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না।"

মেয়েটি বলত, নিশ্চয় সেটা ছিল এমন বিশেষ খাবার, যা আল্লাহ্‌ই খুবায়বকে খাওয়াতেন।

কিন্তু হযরত খুবায়ব (রা.)-এর এসব সম্মান ও আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর এসব মর্যাদা দেখা সত্ত্বেও হারেসের সন্তানরা হত্যা থেকে বিরত থাকেনি। আসলে শত্রুতা জিনিসটা হয়ই অন্ধ, বধির। দেখেও দেখে না, শোনেও শোনে না। ফলে এক সময় (চরম শত্রু) হারেসের (কাফের) সন্তানরা হযরত খুবায়ব (রা.)-কে হত্যা করার জন্যে হারামের বাইরে নিয়ে গেল। হারামের বাইরে এমন কেউ কি আছে যাকে তারা ভয় করবে? তাদের দেখার কি কেউ ছিল? হারামে জুলুম অবৈধ, আর হারামের বাইরে জুলুম বৈধ, এ রকম কি কোন কথা আছে? আসল কথা হলো, কুফর অন্ধ, কুফর বধির। শয়তান কিছু দেখে না, কিছু শোনে না।

যখন মৃত্যু সম্পর্কে হযরত খুবায়ব (রা.) নিশ্চিত হয়ে গেলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে দুই রাকাআত সালাত আদায় করার সুযোগ দাও। তারা সুযোগ দিলে হযরত খুবায়ব (রা.) দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাত থেকে ফারেগ হয়ে বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল সালাত আরো লম্বা করি। আমার রবের সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার বড়ই বাসনা ছিল, কিন্তু আমার মনে হলো, এতে তোমরা বলবে, দেখো আসলে মৃত্যু বিলম্বিত করার জন্যেই খুবায়ব সালাতকে লম্বা করছে। নিহত হবে জেনে খুবায়ব ভয় পেয়ে গেছে। তাই তা করলাম না।

এখন আমি তোমাদের সামনে দাঁড়ান। তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পার। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি এদেরকে একেক করে গুণে নাও এবং তাদের সবাইকে তুমি হত্যা করো। কাউকে ছেড়ো না। তার পর আবৃত্তি করলেন ঃ

'যবে আমি নিহত হই মুসলিম হওয়ায়,
নেই কোন মোর পরওয়া,
যেভাবে, যে পাশেই হোক তা
আল্লাহ্র জন্যই মোর যাওয়া।'

ওরা হযরত খুবায়ব (রা.)-কে ফাসির কাষ্ঠে তুলল। অতঃপর চারদিক থেকে তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। আর পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠল। আহা কত উত্তম ছিল সেই সওয়ার! আর কত ঘৃণ্য ছিল সেই সব উল্লাসকারী!

তারা কি এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে উল্লাস করছে, যে নিজেকে আল্লাহ্র জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে? পরওয়া করেনি, মৃত্যু তাঁর ওপর এসেছে, নাকি তিনি মৃত্যুর ওপর পতিত হয়েছেন।

তারা কি উল্লাস করছে এমন এক ব্যক্তি নিয়ে, যে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, আমানতের খেয়ানত করেনি, মিথ্যা বলেনি, কারো ওপর জুলুম করেনি, এমন কি একবারের জন্যেও তাদেরকে বলেনি তাকে ছেড়ে দিতে?

তারা কি উল্লাস করছে এমন এক ব্যক্তি নিয়ে যে তাদেরকে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু তারা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে তাদের ওপর আস্থা রেখেছে, কিন্তু তারা তাঁর সাথে গাদ্দারী করেছে।

তারা হযরত খুবায়ব (রা.)-কে কাঠের ওপর তুলেছিল এবং বর্শা দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছিল। নবী করীম (সা.)-এর সাথে তাঁর মহব্বত ভালবাসা কতটুকু তা একটু পরীক্ষা করতে চাইল তারা। হযরত খুবায়ব (রা.) তখন পর পর বর্শার আঘাতে ভীষণ আহত। বর্শা তাঁর শরীরের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে, ছিঁড়ে ফেলেছে তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গার মাংস। এমন অবস্থায় বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যায়। মানুষ নিজ মা-বাবা, ভাই, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে পর্যন্ত ভুলে যায়। এহেন এক নাজুক মুহূর্তে হযরত খুবায়ব (রা.)-কে তাঁরা বলতে লাগল, হে খুবায়ব! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাদেরকে একটু বলো, তোমার স্থানে মুহাম্মদ হোক তা কি তুমি পছন্দ করবে? এতে হযরত খুবায়ব (রা.) অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে জোরে চিৎকার করে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা আমাকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে তাঁর পায়ে একটি কাঁটাও বিঁধুক তাও আমি পছন্দ করব না। এ বজ্র নির্ঘোষ বক্তব্য শুনে উপস্থিত সবাই অপার বিস্ময়ে হতবাক হলো! তাদের বিবেক তাদেরকে ধিক্কার দিল, কিন্তু তারা তা প্রকাশ হতে

দিল না এবং মনোযোগ দিল হযরত খুবায়বের শেষ বিদায়ের হৃদয় বিদারক দৃশ্যের প্রতি। আল্লাহ্‌র বান্দা রাসূলের একান্ত প্রেমিক খুবায়ব তখন নিষ্ঠুর দুনিয়া ছেড়ে চিরদিনের জন্য পাড়ি জমাচ্ছিলেন পরকালের অন্তহীন সুখের পানে।[১]

আল্লাহ্‌ রহমত বর্ষিত হোক তোমার ওপর হে খুবায়ব! তুমি প্রেমিকদের আদর্শ প্রবর্তন করে গেলে, পেছনে রেখে গেলে অনাগত মানুষদের জন্যে এক অনুপম স্মৃতি!

(১) সীরাতে ইবন-হিশাম, বুখারী ঃ কিতাবুল মাগামী

নিহতের সেই কথায় খুনী হয়ে গেল মুসলমান

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদা একদল সাহাবীকে কিছু লোকের আবেদনের পর এক জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। সংখ্যায় সাহাবীরা ছিলেন সত্তর জন। তাঁরা ছিলেন বাছাইকৃত মুসলমান। এ দলে সাহাবী হারাম ইবনে মালহান (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূল (সা.) প্রেরিত সেই অভিযানে জাব্বার ইবনে সালমা নামে একজন মুশরিক তাঁকে হত্যা করেছিল। স্বাভাবিকভাবে এ খুনী মুশরিকের মুসলমান হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আলোচ্য ঘটনার কয়েকদিন যেতে না যেতেই সেই খুনী ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে লোকেরা সবাই হতবাক হয়ে যায়! সকলে তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণের হেতু জানতে চায়। সবাই পীড়াপীড়ি করলে সে বর্ণনা করে ঃ

নিশ্চয় আমার ইসলাম গ্রহণের একটি কাহিনী আছে। তা হলো, আমার সাথে জনৈক মুসলমানের মোকাবেলা হয়েছিল। তার নাম হারাম ইবনে মালহান। মোকাবেলার এক পর্যায়ে আমি তার উভয় ঘাড়ের মাঝখানে বর্ষার আঘাত হানলাম। বর্শার ধারাল অগ্রভাগ যে তার বক্ষ ভেদ করে দিল সে দৃশ্য আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলাম। ঠিক সে মুহূর্তে আমি তাকে বলতে শুনলাম, কাবার রবের কসম,

আমি সফল হয়ে গেছি। আমি মনে মনে বললাম, এ বাক্যের অর্থটা কি? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না, না! নাকি এ মিথ্যা বলছে? মানুষ তো মৃত্যুর সময় মিথ্যা বলে না। জীবনের অন্যান্য সময় মিথ্যা বললেও মৃত্যুর সময় তো মানুষ অসত্য বলে না। আরব সমাজে তো এ রকম মিথ্যার ঘটনা পাওয়া যায় না।

খুনী জাব্বার ইবনে সালমার অবাক হবার কথা! অবাক হবার অধিকারও তাঁর আছে। সে মনে মনে ভাবে, আমি তো লোকটাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করেছি এবং বর্শা তার শরীরের এক পাশে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বেরও হয়ে গেছে। লোকটা রক্তাক্ত অবস্থায় ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে বলল, কাবার রবের কসম, আমি সফল হয়ে গেছি! সে তো নিশ্চয় জানে, তার স্ত্রী শীঘ্রই বিধবা হয়ে যাবে। ছেলে, সন্তান এতীম হয়ে যাবে। সে নিজেও বঞ্চিত হবে দুনিয়ার সব ধরনের স্বাদ থেকে। খানাপিনা, সূর্যের আলো, চাঁদের আলো॥সব কিছু হতে বঞ্চিত হবে। কারো সাথে কোন কথা, কোন আলাপ করারও আর সুযোগ পাবে না। কবরের অন্ধ গহ্বর ছাড়া আর কিছুই তার সাথে রইবে না। তা হলে কিসের সাফল্যের কথা সে বলছে?

তাঁর এ বাক্য সম্পর্কে কতিপয় মুসলমানের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তারা উত্তর দিল, সেটা শাহাদাত লাভের সাফল্য। যেহেতু সে মহান আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ ঈমান রাখত, বিশ্বাস করত পরকালের ওপর। সেহেতু সে

জানত, শহীদের কী মর্যাদা, কী সৌভাগ্য! আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের যে নেয়ামত দ্বারা শহীদরা কামিয়াব হয় সে সব কিছু সে একান্ত মনে বুঝত। নিজের বেলায়ও সে সব কিছু যেন সে স্বচক্ষে দেখছিল। তাই সে বলেছে, "কাবার রবের কসম, আমি সফল হয়ে গেছি!" এতে আমার বোধদয় হলো। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, সে সত্যিই সফল হয়ে গেছে।

জব্বার ইবনে সালমার চোখ খুলে গেল। তার জানা হয়ে গেল, এ জগত ছাড়াও আরেক জগত আছে। যে খুশী, যে আনন্দ ভোগ করছিল এর চেয়ে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ খুশী বয়ে গেছে সে আনন্দ, সে খুশী শেষ হবার নয়। খুশী ও আনন্দময় সে জীবন অন্তহীন। মহান আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

"কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে!" (সূরা সীজদাহ ঃ ১৭)

তিনি আরো বলেন, "আর যারা আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্‌ নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে।" (সূরা আল্‌-ইমরান ঃ ১৬৯-১৭০)

এভাবেই একটি সহজ সরল বাক্য, যা মুমিন ব্যক্তির অন্তর থেকে বের হয়েছিল, মুখ হতে নিঃসৃত হয়েছিল, একজন কাফেরের ঈমান আনার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এমন কাফের যে বিশ্বাস করত না আল্লাহ্‌কে, তাঁর রাসূল (সা.)-কে, বিশ্বাস করত না পরকালকে। সে যাকে খুন করেছিল তার ধর্মের ওপর এখন তার বিশ্বাস জমে যায়। সে ঈমান এনে ফেলে সেই ধর্মের প্রতি, অতীতে যে ধর্মের সে দুশমন ছিল। যে ধর্মের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে আসছিল, এখন সে কট্টর সেই ধর্মের একজন পূর্ণ ঈমানদার। এ রকম কিছু একনিষ্ঠ ও ঈমানদীপ্ত বাক্য কত বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, পরাজিত করেছে বাহিনীর পর বাহিনী। জয় করে নিয়েছে দেশের পর দেশ।[১]

(১) বুখারী, কিতাবুল মাগায়ী, ইবন হিশাম। (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে পত্র

যদি তোমার কাছে কোন আত্মীয় কিংবা বন্ধু এসে বলে, আমি দেশে যাচ্ছি, অচিরেই তোমার পিতার সাথে দেখা হবে, তোমার কোন খবর আছে? তোমার পিতার কাছে কোন চিঠি-পত্র দেয়ার আছে যা আমাকে তোমার পিতা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে? এ দিকে তোমার কোন সন্দেহও নেই, লোকটি শীগ্‌গিরি তোমার পিতার সাথে সাক্ষাত করবে। অনেক সময় স্বয়ং তোমার পিতা তোমার সম্পর্কে কোন ভাল খবরাখবর জানতে চাইতে পারেন। জিজ্ঞেস করতে পারেন তোমার স্বাস্থ্যের সংবাদ। তখন তুমি হয়ত বলে থাক, আমার পিতাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। বলবেন, আপনার ছেলে ভাল আছে। আপনি যেভাবে কামনা করেন, সে রকম স্বাস্থ্য ও খুশীর মধ্যেই আছে।

এ রকম মুসলমানরাও বিশ্বাস করত, নিশ্চয় মৃত্যু পরকালে যাওয়ার পথে একটি সেতু বৈ কিছু নয়! যে কোন মুসলমান এ সেতু পার হবে, সে পরকালে পৌঁছে যাবে। সেখানে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.)-এর সাথে মিলিত হবে। তাঁর সাক্ষাতে ধন্য হবে। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও তাঁর উম্মাতের খবরাখবর জিজ্ঞেস করবেন।

তোমার সেই আত্মীয় কিংবা বন্ধুটি পথের বাধা-বিপত্তি অথবা কোন দুর্ঘটনার কারণে দেশে নাও পৌঁছতে পারে অথবা সে ঠিকই দেশে পৌঁছেছে, কিন্তু তোমার পিতার সাথে তার সাক্ষাত হয়নি। এটা নেহায়েত সম্ভব। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পরকালে পৌঁছার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করত না। একটু সন্দেহ হতো না তাঁদের রাসূলল্লাহর (সা) সাথে শহীদ ব্যক্তির সাক্ষাত সম্পর্কে।

এক সময় মুসলমানরা সিরিয়া অভিমুখে অভিযান চালিয়ে ছিল। নবী করীম (সা.) তাদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, "তোমরা অবশ্যই অবশ্যই কিসরা ও কায়সারের ভাণ্ডার জয় করবে।" এ উভয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যেরও ওয়াদা করেছিলেন। তিনি এরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় আমার বাহিনী সাহায্য প্রাপ্ত হবে। নিশ্চয় তাদের ওপর আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।" সুতরাং মুসলমানরা আল্লাহ্প্রদত্ত সাহায্য ও বিজয়ের ওপর পুরা আস্থাভাজন ছিল, হয়েছেও তাই। তারা শহরের পর শহরের জয় করে নিয়েছিল। বাহিনীর পর বাহিনীকে করেছিল পরাজিত।

ইয়ারমুক যুদ্ধের দিন জনৈক মুসলমান সৈনিক মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার হযরত আবূ ওবায়দাহ (রা.)-এর নিকট এসে বলল, আমি শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত। রসূল্লাহর (সা)-এর প্রতি আপনার কোনো বার্তা আছে?

হযরত আবূ ওবায়দাহ (রা.) বললেন: হ্যাঁ, আপনি আমার পক্ষ হতে তাঁকে সালাম দেবেন এবং বলবেন, হে রসূলাল্লাহ (সা.) আমাদের রব আমাদের সাথে যে সব প্রতিশ্রুতি-অঙ্গীকার করেছিলেন, তা আমরা যথাযথভাবে পেয়েছি।[১]

১. আল-বিদায়াহ ওয়াল নেহায়াহ লি ইবন কাসীর, খণ্ড ঃ ৭, পৃষ্ঠা ঃ ১২)

লাভের বদলে ক্ষতি

হযরত আবূ বকর (রা.) ছিলেন মুসলমানদের প্রথম খলীফা। বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তিনি ভাতা নিতেন। তখন ইসলামী খেলাফত সারা আরব উপদ্বীপে বিস্তৃত ছিল এবং যুদ্ধ-জয়ের মাধ্যমে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও দিন দিন বিস্তার লাভ করছিল খেলাফতের পরিধি। এতো বড় বিশাল রাষ্ট্রের শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বায়তুল মাল হতে এতটুকুই নিতেন যা দিয়ে কোনমতে তাঁর ও ছোট পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হতো। খেলাফতের দায়িত্ব নেয়ার পূর্বে পেশাগতভাবে তিনি ব্যবসা করতেন। কিন্তু দায়িত্ব নেয়ার ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো সম্ভব হয়নি। ফলে তিনি তাঁর পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য বায়তুল মাল হতে ভাতা নিতে বাধ্য হন। কারণ খেলাফতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ততা, রাষ্ট্র পরিচালনা, মুসলমানদের কল্যাণে তাঁর গোটা সময় অতিবাহিত হওয়ার দরুন স্বীয় জীবিকা অর্জনের জন্যে একদম সময় পেতেন না।

বায়তুল মাল থেকে যা নেয়া হতো, তার সবটুকু সেই খাদ্য-তরকারি ও রুটির পেছনে ব্যয় হয়ে যেতো যা খেয়ে খলীফা ও তাঁর সন্তানরা কোনমতে জীবনে বেঁচে থাকতেন। যার কারণে খলীফার স্ত্রীর পক্ষে নগরের অন্য

ধনাঢ্য লোকদের মত খাওয়া-দাওয়ায় বৈচিত্র্য আনার ও একটু বেশী করে খাবার পাক করার কোন সুযোগ ছিল না। পরিবারের জীবিকার উৎস যখন ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তখন তাঁদেরও অবস্থা খুব ভাল ছিল, অত্যন্ত সচ্ছল ছিল।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ছোট ছোট সন্তানদেরও ভরসা করতে হতো সে অল্প ভাতার ওপর। প্রতিদিন একই ধরনের সাধারণ খাদ্য। তাও আবার পেট ভরে করে খাওয়া যায় না। শহরের অন্যান্য পরিবারের যাদেরকে আল্লাহ্ ধনী বানিয়েছেন, সম্পদ বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেই সব ধনী পরিবারের সমবয়সী ছেলে-সন্তানদের মত পেট ভরে খেতে পান না। একটু হালুয়া, কয়েকটা ফলমূল খাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ওদের মত খেতে পারে না। কারণ ওদের বাবার তো ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, বাগান আছে, বিভিন্ন ক্ষেত আছে। আর এদের তো তা নেই।

স্নেহময়ী মা একদিন তা অনুভব করলেন। ছোট ছোট সন্তানের মিষ্টি মুখ করার তথা হালুয়া বানিয়ে তাদের একটু খুশী করার ইচ্ছা করলেন। তিনিও তো একজন মানুষ!

অতঃপর তিনি একদিন তাঁর মহান স্বামীর নিকট তাঁর অনুমতি চাইলেন। বললেন, বায়তুল মালের ভাতা একটু বাড়িয়ে দিতে। স্বামী উত্তর দিলেন, মুসলমানদের বায়তুল মাল যাতে গরীবে-মিসকীন ও অভাবী মানুষদের অধিকার

রয়েছে, তাতে খাওয়া-দাওয়ায় বৈচিত্র্য আনার ও মনের স্বাদ মেটানোর অবকাশ নেই।

স্ত্রী বললেন, আমাদের খরচ থেকে যদি আমি কয়েক দিন পর্যন্ত কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখি এবং এভাবে আমাদের জন্য কিছু খরচের পয়সা যদি জমা হয়ে যায়, তা দিয়ে হালুয়া কিনতে কোন বাধা আছে কি? তিনি বললেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই। তা তো তোমার সামর্থ্য ও প্রচেষ্টারই ফসল। তারপর থেকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্ত্রী বেশ কয়েক দিন ধরে তার নির্দিষ্ট খরচ হতে কিছু কিছু এর পরিমাণ পয়সা জমালেন যা দিয়ে হালুয়া কেনা যায় এবং দেরহাম তথা পয়সাগুলো আবূ বকর (রা.)-এর নিকট দিয়ে বললেন, এই ধরুন, কিছু দেরহাম। এগুলো দিয়ে আমাদের জন্যে হালুয়া ক্রয় করতে পারবেন।

আর এদিকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অবস্থা ছিল, তিনি দেরহামগুলো বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেবেন।

সুতরাং তিনি বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বললেন॥

আমার কাছে প্রমাণিত হলো, আমার পরিবার চলার জন্য ও পরিবারের সদস্যদের জীবিকা নির্বাহের জন্যে যত পরিমাণ দেরহাম বায়তুল মাল হতে জারি ছিল, তা থেকে

কম দেরহামের ওপর পরিবার চলতে পারে। তাই আপনি আমাদের প্রতিদিনের খরচ হতে এই পরিমাণ দেরহাম কমিয়ে দেবেন। কারণ এগুলো আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আর মুসলমানদের বায়তুল মাল এজন্যে নয় যে, তা দ্বারা খলীফার পরিবারের সচ্ছলতা আনা হবে এবং খাওয়া-দাওয়ায় উদারতা লাভ করবে।

ফলশ্রুতিতে তাই হলো, প্রতিদিনের ভাতা থেকে ঐ পরিমাণ দেরহাম কমিয়ে দেয়া হলো। যে পরিবারের প্রধান এক বিশাল রাষ্ট্র শাসন করতেন, যার কাছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গনীমতের মালসহ অঢেল সম্পদ আসত, সেই সৎ সৌভাগ্যবান পরিবারের ভাগ্যে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই জুটল। যে হালুয়ার খাওয়ার স্বাদ জেগেছিল তাদের সে স্বাদ মেটাতে পারলেন না। হালুয়া খাওয়া হলো না, বরং পূর্বে প্রতিদিন বায়তুল মাল থেকে যে ভাতা লাভ করতেন, এখন তা থেকেও কম ভাতার ওপর সন্তুষ্ট হতে বাধ্য হলেন। হযরত সিদ্দীক (রা.)-এর স্ত্রীর তাঁর মহান স্বামী যা করেছেন তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলে। সেটাকে লোকসান মনে করলেন না।১ মহান আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন: উত্তম পুরুষদের জন্যে উত্তম নারীরা এবং উত্তম নারীদের জন্যে উত্তম পুরুষরা।" (সূরা নূর ২৬)

হযরত আবূ বকর (রা.) মুসলমানদের শাসকদের জন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। খাওয়া-দাওয়া ও

ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর ওপর অল্পে তুষ্টি ও দুনিয়াবিমুখিতাকে প্রাধান্য দিতেন, পরকালকে ইহকালের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। আর আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তাই সর্বোত্তম ও সবচে' স্থায়ী।" (আল কুরআন)

আল্লাহ্ আবূ বকরের প্রতি ও অন্যান্য সৎ পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।[১]

১. ইবনুল আসীর ঃ আল কামিল ফিত্‌তারীখ, খণ্ড ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ৪২৩)

বায়তুল মুক্বাদ্দিস অভিমুখে হযরত উমরের (রা) যাত্রা

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-খেলাফতের সময়। সিরিয়া অঞ্চলে এলাকার পর এলাকা জয় করে যাচ্ছিল মুসলিম বাহিনী, এমন কি ক্বুদস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখানেই রয়েছে সেই পবিত্র মসজিদে আক্বসা।

এখানে যে সব খৃস্টান সিরিয়া ও রোম শাসন করত তারা আবেদন জানাল মুসলমানদের খলিফা স্বয়ং এসে সন্ধিপত্র লিখে দিলে তারা পবিত্র মসজিদে আক্বসার চাবি হস্তান্তর করবে। কারণ ব্যাপরটা মোটেই সাধারণ ব্যাপার ছিল না। আল ক্বুদসও অন্যান্য শহর ও দেশের মত নয়, বরং এর এমন কিছু শান-মান রয়েছে যা অন্য কোন শহরের মধ্যে নেই। এটা সেই মসজিদ যা হযরত সুলায়মান (রা.) নির্মাণ করেছিলেন। এখানে পরবর্তী নবীরা সালাত আদায় করেছেন। যদি তা হস্তান্তর করতেই হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান ও মুসলমানদের খলিফার হাতেই করতে হবে।

সুতরাং মুসলমানদের সেনাপ্রধান হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-র খবর জানিয়ে আমিরুল মুমিনীন বরাবর পত্র লিখলেন এবং বললেন, বায়তুল মুক্বাদ্দেস-এর বিজয় এখন তাঁর আগমনের ওপরই নির্ভর করে। সুতরাং হযরত উমর

(রা.) এ বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এভাবে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কিছু কিছু সাহাবী তাঁর সফরের বিষয়ে নীরবতা পালন করলেন এবং পরামর্শ দিলেন খৃস্টানদের নাকে খত দেয়ার উদ্দেশে সেখানে না যেতে। কিন্তু হযরত আলীর (রা.) পরামর্শ ছিল বায়তুল মুকাদ্দেস অভিমুখে সফর করার পক্ষে। যেহেতু এর মধ্যেই সম্মান, সৌভাগ্য ও মুসলমানদের জন্য বিষয়টি সহজ করার উপায় নিহিত।

হযরত ওমর (রা.) শেষোক্ত পরামর্শটি গ্রহণ করলেন এবং সফরের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। হযরত আলী (রা.)-কে মদীনার ভারপ্রাপ্ত খলীফা নিযুক্ত করে রওয়ানা হয়ে গেলেন সিরিয়ার দিকে।

এখন আমরা দেখব হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কিভাবে সফর করেছিলেন। যাঁকে রোমান পারস্যের সম্রাটরা ভয় করতেন এবং যাঁর নাম শুনলে পর্যন্ত অন্তর ভয়-ভীতিতে ভরে যেত, বরং তাঁর মর্যাদা, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দিক দিয়ে তা অনেক কমই ছিল। যখন তিনি রাজ্যের ও শাসনাধীন কোন শহরে সফর করতেন তখন তো এ অবস্থা! আর যদি কোন দূরবর্তী দেশ কিংবা রাষ্ট্র যা দীর্ঘ কাল পর্যন্ত বিজাতীয়দের শাসনাধীনে ছিল, তাহলে তো কথাই নেই! বিজেতা শাসকের যাত্রা, তাঁর মান-মর্যাদার দৃশ্য দেখার জন্য যে কারোর চোখ বিস্ফারিত হবার কথা। রাজকীয় সফরের কাহিনী বিরাট গুরুত্বের

সাথে লিখিত হতো ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে। লোকেরা এ সব রাজকীয় সফর ও রাজভ্রমণের কথা পরস্পরে আলোচনা করে। তাদের মন-মানস শ্রদ্ধায় ভরে যায়। কিন্তু এখানে ব্যাপার ছিল একদম উল্টো। যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার একেবারে বিপরীত। এসো প্রিয় পাঠক, সেই সফরের কাহিনী শোনা যাক।

হযরত উমর (রা.) যখন সিরিয়া অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হলেন, ছাই বর্ণের একটি উটের ওপর সওয়ার হয়ে, টুপিবিহীন, তাঁর মস্তকের অগ্রভাগ সূর্যের আলোতে চিকমিক করছিল। পাদান না থাকাতে তাঁর উভয় পা সওয়ারীর উভয় পাশে ঝুলছিল। সাথে ছিল উলের একটি চাদর। যখন আরোহণ করতেন চাদরটা জিন পুশ হিসেবে ব্যবহার করতেন, আর কোথাও অবস্থান নিলে তাই বিছানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তাঁর ব্যাগ ছিল সাধারণ কালো ডোরা কাটা দাগের কিংবা খেজুর গাছের ছালে ভরা চাদর। আরোহণ কালে তা ব্যাগ, আর বিশ্রাম কালে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করতেন। গায়ে ছিল এক ধরনের মোটা কাপড়ের জামা। তাও স্থানে স্থানে দাগ পড়ে গিয়েছিল এবং কোণায় কোণায় ছিঁড়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে দ্বিতীয় কোন জামাই ছিল না পরিধানের জন্য ।

তিনি (রা.) বললেন, কওমের সদার্রকে ডেকে আনা হোক! তারা তাকে ডেকে আনল। তখন হযরত উমর

(রা.) বললেন, তোমরা আমার জামাটাকে একটু ধুয়ে দাও এবং ছিন্ন ছিদ্রগুলো সেলাই করে দাও এবং আমাকে একটি কাপড় কিংবা একটি জামা ধার দাও। সুতরাং একটি কাতানের জামা আনা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? লোকেরা উত্তর দিল কাতানের জামা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কাতান কি? তারা তাঁকে কাতান সম্পর্কে অবহিত করল। অতঃপর তিনি গায়ের জামাটি খুলে দিলেন। যখন তা ধুয়ে জোড়া তালি দিয়ে তাঁর সামনে আনা হলো, তখন ধার নেয়া কাপড়টি খুলে নিজেরটা পুনরায় পরে নিলেন।

খ্রিস্টানদের সর্দার হযরত উমরের (রা.) উদ্দেশে বললেন, আপনি আরবদের রাজা। এলাকায় চলাচলের জন্যে উট ভাল সোয়ারী নয়। আপনি যা গায়ে পরেছেন তা ছাড়া অন্য একটা ভাল পোশাক পরলে ও ভাল তুর্কী ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে আসলে তা রোমবাসীদের চোখে আরো মহান দেখাত। হযরত উমর (রা.) বললেন, আমরা এমন এক জাতি আমাদেরকে আল্লাহ্ ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অতএব, গায়রুল্লাহর কাছে এর কোন বিকল্প চাই না।[১]

হ্যাঁ, এ রকমই ছিলেন মুসলমানদের খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর শান অবস্থা যাঁর নাম

১. ইবন কাসীর ঃ আল বিদায়াহ ওয়াল নেহায়াহ।

শুনলে বড় বড় রাজা-বাদশার ঘুম হারাম হয়ে যেত, যাঁর বিজয়ে পূর্ণ ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দিগন্ত। সে উমরের (রা.) মদীনা ও আল কুদস-এর সফর ছিল এরকম, সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর। তাঁর এ সফর অনেক শহরের ওপর দিয়ে হয়েছিল যেগুলো উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে শীর্ষে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, সেখানকার বাসিন্দাদের চোঁখ আটকে গিয়েছিল তাঁর প্রতি। বিস্ফারিত নয়নে অবাক হয়ে দেখেছে অনাড়ম্বর এ রাজকীয় সফর! মহান আল্লাহ্ সত্যিই বলেছেন ঃ

"নিশ্চয় (আসল) সম্মান তো আল্লহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যে, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"

জিনিসের যথার্থ মূল্যায়ন ও তারপূর্ণ প্রাপ্তি দান

আমাদের প্রত্যেকেই ভাল কাজের মূল্যায়ন করি নিশ্চয়। ভাল কাজে মুগ্ধ হই। ভাল কাজ যে করে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, যেমন মুগ্ধ হই কারো উদারতায়, সমাজ সেবায়, দুঃস্থ মানবতার সহযোগিতায়, ভুখা লোকদের অন্নদানে, পীড়িত আক্রান্ত জনের মাথায় সান্ত্বনার হাত বুলালে। যে এসব ভাল কাজ করে তার প্রশংসা করা হয় এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয় ও তাকে আমরা বলি, তুমি খুব ভাল কাজ করেছ। আল্লাহ্ তোমাকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন!

তবে ভাল কাজ-কর্মগুলো মানুষের মান ও সংকল্প শক্তি অনুযায়ীই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা যার স্বভাবে যতটুক ভাল কাজের প্রতি ভালবাসা, তার যথার্থ মূল্যায়ন ও পূর্ণ প্রাপ্তি দান, ধন-সম্পদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব ও ভাল কাজ করার স্পৃহা দান করেছেন সে মতেই ভাল কাজ-কর্ম সম্পাদিত হয়। জনৈক কবি সত্যি বলেছেন, "ব্যক্তির মহানুভবতা বিচারেই হয়ে থাকে মহোত্তম কাজগুলো।"

আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই রসূলুল্লাহ (সা.)-এর তনয়া হযরত ফাতেমা (রা.) ও আমীরুল মুমিনীন হযরত

আলী ইবনে তালিবের (রা.) আদরের সন্তান দুলাল হযরত হাসান (রা.)-কে চেনো এবং জানো। তিনি স্বভাবে ও সেকলে সূরুতে প্রায় রসূলুল্লাহর (সা.) মত ছিলেন। রসূল কারীম (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "আমার এই নাতি নিশ্চয় একজন সর্দার হবে।" তোমাদেরকে এমন এক কাহিনী বলব যাতে এই হযরত হাসানের উন্নত সংকল্প শক্তি, ভাল ও সুন্দর কাজের যথার্থ মূল্যায়ন এবং তার পূর্ণ প্রাপ্তি দানের বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

একবার হযরত হাসান (রা.) মদীনার কোন এক বাগান দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি, হাতে তার একটি রুটি রয়েছে। রুটি ছিঁড়ে একটু করে সে নিজে খাচ্ছে, আরেক টুকরো তার পাশের কুকুরটাকে খাওয়াচ্ছে। এভাবে করতে করতে পুরো রুটির অর্ধেক নিজে খেল আর অর্ধেক কুকুরটাকে খাওয়াল।

এ ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য, যা সচরাচর দেখা যায় না। কারণ অনেক মানুষই খাবার নিজে একা খায়, অন্য কাউকে দিতে চায় না। আর এ কৃষ্ণাঙ্গ লোকটির হয়ত তাই ছিল সেদিনের একমাত্র খাবার। কিন্তু সে রুটির অর্ধেক কুকুরটাকে ভাগ করে দিল খাবারের অত্যন্ত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও। অবশ্যই কুকুরের জন্যেও তার মালিকের দেয়া নির্দিষ্ট খাবার ছিল অথবা মালিকের দস্তরখানার অবশিষ্ট হতে কিংবা বাগানে এমন কিছু

পাওয়ার সুযোগ ছিল যা দিয়ে অনায়াসেই তার তৃপ্তি মিটত। এ ছাড়াও কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি স্বীয় সীমিত খাবারের অর্ধেকটা কুকুরটিকে দিয়ে এক অনুপম মহানুভবতার পরিচয় দিল।

এ বিস্ময়কর দৃশ্য হযরত হাসান (রা.)-এর মনোযোগ আকৃষ্ট করে। তিনি থেমে গেলেন এবং কৃষ্ণাঙ্গ গোলামটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করল কুকুরটাকে নিজের অর্ধেক খাবার দিতে এবং তুমি তাতে একটুও কমতি করলে না অর্থাৎ অত্যন্ত ন্যায়ের সাথে তুমি এ খাদ্য বণ্টনের কাজটি করলে, অথচ এটা নিশ্চিত যে, এ বণ্টন দেখারও কেউ সেখানে ছিল না, কুকুরেরও এমন কোন ভাষা নেই, যদ্দ্বারা সে অভিযোগ করবে, কৃষ্ণাঙ্গের জিম্মায় কুকুরের এমন কোন ঋণ কিংবা হকও ছিল না, যার সে আবেদন করবে। কৃষ্ণাঙ্গ গোলামটি উত্তর দিল, কুকুরটির চোখে চোখ রেখে ভাগে ভাগে কম দিতে বা ঠকাতে আমি লজ্জাবোধ করেছি।

এ দৃশ্য ও গোলামের এ উত্তর হযরত হাসান (রা.)-এর হৃদয়ে ভীষণভাবে রেখাপাত করল এবং তাঁর ভেতরকার সুপ্ত মানবতাকে জাগিয়ে তুলল। তাঁর সেই মহান চরিত্রকে নাড়া দিল যা তিনি তাঁর নানা (হযরত মুহাম্মদ সা.) হতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন এবং যে নানা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই আপনি মহান

চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।"

অতঃপর হযরত হাসান (রা.) কৃষ্ণাঙ্গ গোলামকে বললেন, তুমি কার গোলাম?

বলল, আমি আবান ইবনে উসমানের গোলাম।

হযরত হাসান (রা.) বললেন, এ বাগান কার?

গোলামের উত্তর ঃ এটা আবানের।

তারপর হযরত হাসান (রা.) তাঁকে বললেন, তোমাকে আমি শপথ দিচ্ছি, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে নড়বে না।

এ বলে হযরত হাসান (রা.) সেখান থেকে চলে গেলেন। গিয়ে মালিকের কাছ থেকে গোলাম ও বাগানটা কিনে নিলেন। এখানে আমরা প্রত্যেকেই পরিমাপ করতে পারি, হযরত হাসান (রা.)-গোলাম ও বাগান ক্রয় করতে কি পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছেন! এই ব্যয়বহুল জিনিসের জন্যে তাঁকে কি পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এর পর হযরত হাসান (রা.) গোলামটির নিকট এসে বললেন, আমি তোমাকে কিনে ফেলেছি। এ শুনে গোলাম দাঁড়াল এবং বলল, আমার আনুগত্য উৎসর্গীকৃত হোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল, অতঃপর আপনার প্রতি, হে আমার মালিক! হযরত হাসান (রা.) বললেন, আমি বাগানটাও কিনে নিয়েছি। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আজ হতে তুমি স্বাধীন এবং বাগানটাও আমর পক্ষে হতে তোমার জন্যে হাদিয়া।[১]

---

১. ইবন আসাকিরঃ তাহযীবু তারীখি দেমসক, আল কবীরঃ খণ্ড ঃ ৪ পৃষ্ঠা ঃ ২১৮

তখন গোলামটি কি পরিমাণ হতবাক হয়েছিল তা তুমি আর জিজ্ঞেস করো না। খুশীতে আনন্দে একদম আত্মহারা! কারণ সে এখন মুক্ত স্বাধীন জীবন ভোগ করবে। সাথে সাথে তার মালিকনাধীনে রয়েছে সেই বিশাল মূল্যবান বাগানটিও।

সময়ের সবচেয়ে বড় শাসকের দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহ্‌ভীরুতা

উমাইয়া যুগের নেককার খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় শাসক। তাঁর শাসনাধীনে ছিল সিরিয়া, মিসর, ইরাক, আরব উপদ্বীপ, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, ইরান ও খোরাসান এলাকা। তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত হয়ে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

এই হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর সম্পদ ও জায়গীর সব কিছু থেকে অব্যাহতি নিলেন। যা কিছু ছিল সব মুসলমানদের সাধারণ বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফিরিয়ে দিলেন, এমন কি তাঁর স্ত্রীর গয়না-অলংকার পর্যন্ত বায়তুল মালে রেখে দিলেন। দুনিয়াবিমুখতা, সাদা মাটা কষ্টকর জীবন যাপনে তিনি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে

গিয়েছিলেন, যে পর্যায়ে রাজা-বাদশাহ তো দূরের কথা, দুনিয়াবিমুখ ইবাদত গোজার পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম। তাঁর একটা মাত্র জামা ছিল, যা ভেজালে শুকানোর অপেক্ষায় কখনো কখনো জুমার নামাজে যেতে বিলম্ব হয়ে যেত। তাঁর দৈনিক খরচের পরিমাণ দুই দেরহামের বেশি হতো না। তিনি জনসাধারণের চুলায় নিজের পানি গরম দেয়া থেকে পর্যন্ত বিরত থাকতেন আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে। বায়তুল মালের তেলে প্রজ্বলিত বাতির আলোতে রাষ্ট্রীয় কাজ করার মাঝখানে কেউ যদি তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থা জানার উদ্দেশে বলতেন: আমীরুল মুমিনীন, কেমন আছেন আপনি? আপনার পরিবার-পরিজন কেমন আছে? তিনি সাথে সাথে সরকারী বাতি নিভিয়ে দিতেন এবং স্বীয় মালিকনাধীন বাতি আনাতেন অথবা প্রশ্নকর্তা বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর অন্ধকারেই দিতেন।

একবার তিনি পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদেরকে সালাম দিলেন। তখন তিনি দেখলেন, তাঁর মেয়েদের প্রত্যেকেরই মুখে হাত। কথা বলার সময়েও মুখে হাত রেখেই কথা বলছে তারা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে অপারগতা প্রকাশ করে বলল, ঘরে ডাল আর পেঁয়াজ ছাড়া খাওয়ার আর কিছুই ছিল না, তাই সেগুলোই তারা খেয়েছে। এখন এগুলোর দুর্গন্ধ পিতার নাকে লাগবে আশংকায় তারা মুখে

হাত রেখেই বলেছে। এ কথা শুনে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আমার মেয়েরা! এমন সব রঙ-বেরঙের খাবার খেয়ে তোমাদের কি লাভ, যা তোমাদের পিতাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে? মেয়েরা সেদিন কোন উত্তর দেয়নি। কষ্টকর দুনিয়াবিমুখ সাদাসিধে জীবন যাপনের ওপরই তারা সন্তুষ্টি জানিয়েছিল, অথচ তাদের পিতা সেই যুগের সবচেয়ে বড় শাসক। তাদের পিতার কর্মচারীরা ও রাষ্ট্রের অনেক প্রজা পর্যন্ত মজাদার সুস্বাদু খাবার, মূল্যবান সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় ও আমারদায়ক বিলাসবহুল জীবন যাপন করে যাচ্ছিল।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-র এই আল্লাহ্ভীরুতা শুধু তাঁর ব্যক্তি জীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর সাধারণ রাজনীতিও তাই ছিল। তিনি সব সময় কামনা করতেন যাতে যেন তাঁর রাষ্ট্রের কর্মচারী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লোক নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে রক্ষণশীল ও আল্লাহ্ভীরু হয়। আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে যেন হয় খুব উদার। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেরহাম তথা সম্পদ হলো রক্তের মত। তাই এ রক্ত তার নির্দিষ্ট শিরা-উপশিরা ব্যতীত অন্য কোথাও প্রবাহিত হওয়া অবৈধ। এ সম্পদ জীবনের বিলাসিতায় ও চাকচিক্যে নষ্ট হয়ে যাক তা তিনি পছন্দ করতেন না।

জনৈক গভর্নর স্বীয় প্রদেশের প্রয়োজনীয় লেখালেখির জন্য খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-এর নিকট কিছু কাগজ চেয়ে পত্র লেখেন। পত্র পেয়ে খলীফা উমর (র.) উত্তর দিলেন, "আমার এ চিঠি যখন তোমার নিকট পৌঁছবে তখন থেকে তুমি তোমার কলমকে তীক্ষ্ণ করো, হস্তলিপি আরো ঘন করে ও অনেক প্রয়োজন একটি কাগজে সমন্বিত করে লেখবে। নিশ্চয় মুসলমানদের এমন কোন অতিরিক্ত কথার প্রয়াজন নেই যা তাদের বায়তুল মালের জন্য ক্ষতিকর হয়।"

আরেক গভর্নর তাঁর কাছে অভিযোগ জানালেন, আসসালামু আলাইকুম, প্রতিদিন অসংখ্য হারে নতুন নতুন লোক মুসলমান হওয়ার কারণে বায়তুল মালের ক্ষতি হচ্ছে। কারণ কাফের মুসলমান হওয়ায় তার ওপর আরোপিত জিযিয়া ও (ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ কাফের অধিবাসীদের ওপর নির্ধারিত সরকারী) কর মওকুফ হয়ে যাচ্ছে। ফলে বায়তুল মালের আয়ের উৎস হ্রাস পাচ্ছে। তখন তিনি উত্তর দিলেন ঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ্তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ইসলামের দা'ঈরূপে প্রেরণ করেছেন, রাজস্ব সংগ্রাহক বানিয়ে প্রেরণ করেন নি।"[১]

১. ইবন আবদিন হাকাম ঃ সীরাতু উমর ইবন আব্দুল আজীজ।

আমার নাম উল্লেখ করার দরকার নেই

আমাদের কেউ কোন ভাল কাজ করতে পারলে কিংবা যা দেখে মানুষ মুগ্ধ হয় এ রকম কোন আকর্ষণীয় কৃতিত্ব রাখতে পারলে, "আল্লাহ্ আমাদের মাফ করুন! তখন আমাদের সে লোকটা চায়, তার সে ভাল কাজ ও কৃতিত্বের চর্চা হোক, প্রশংসা করা হোক, তার নাম উল্লেখ করা হোক এবং এ কৃতিত্বের জন্যে সেই স্মরণীয় হয়ে থাকুক। এটা মানুষের স্বভাব। এর জন্যে কাউকে তিরস্কার করা যায় না। তবে যে সকল মুসলমান নবী করীম (সা.)-এর গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং ইসলামী বৃক্ষের ছায়া ও আদলে লালিত-পালিত হয়েছেন, তাঁদের অবস্থা কিন্তু এর চেয়ে ভিন্ন ছিল। তাঁরা এমন নিখুঁতভাবে প্রতিপালিত হয়েছেন, তাঁদের থেকে ইখলাস, নিষ্ঠা, বিনয়, বিনম্রতা, খ্যাতি ও প্রচুরবিমুখতার এমন সব বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে, যা ইতিহাসবিদদেরকে রীতিমত হতভম্ব করে দিয়েছে। এখানে এ সংক্রান্ত অনেক ঘটনা ও কাহিনী থেকে একটি ছোট্ট কাহিনী প্রিয় পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

যখন মুসলমানরা প্রাচীন ইরানের রাজধানী মাদায়েন জয় করে নিজেদের অধীনে নিয়ে এল এবং পরাজিত হয়ে গেলে গোটা শহর তখন মুসলমানরা প্রচুর মালে গনীমত

লাভ করল যা ছিল সে যুগের সবচেয়ে বেশি সম্পদ। আর আরবরা অর্থাৎ মুসলমানরা ছিল উটের রাখাল। তাদের ঘর-বাড়িও ছিল সাধারণত পশমের। যুদ্ধ শেষে প্রত্যেকে নিজ হাতে আসা গনীমতের মাল আমীরের নিকট জমা দিতে লাগল। এভাবে জনৈক মুসলিম সৈনিক নিজের অংশটা নিয়ে ইসলামী সেনাপ্রধান তথা আমীরের নিকট হস্তান্তর করল। আমীরের আশেপাশের লোকেরা এ দরিদ্র আরব সৈনিকের নিয়ে আসা মালে গনীমতের দামী অংশটা দেখে অবাক হয়ে গেল। তারা বলল, এ রকম সম্পদ তো আমাদের চোখে পড়েনি! আমাদের সবার কাছে যা আছে সব মিলেও তো এর সমপরিমাণ হবে না, এমন কি এর মূল্যের কাছাকাছিও হবে না। তারা বলল, তুমি কি এখান থেকে কিছু নিয়েছ?

সৈনিক উত্তর দিল, শপথ করে বলছি, আল্লাহ্‌র ভয় না থাকলে এটা তোমাদের কাছেই নিয়ে আসতাম না।

তখন তারা বুঝতে পারল, লোকটি সাধারণ মানুষ নয়। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার পরিচয় কি?

সৈনিক বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম! তা আমি তোমাদেরকে বলব না। কারণ এতে তোমরা আমার প্রশংসা করবে এবং অন্যেরা আমার প্রশংসা স্তুতিতে পঞ্চমুখ হবে, আমার কৃতিত্বের চর্চা করবে। তবে আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি এবং তাঁর সওয়াবের ওপরই

সন্তুষ্ট। এটা বলে সে ওখান থেকে কেটে পড়ল। লোকেরা পিছে পিছে এক ব্যক্তিকে তার সন্ধান নেয়ার জন্যে প্রেরণ করল। সৈনিক যখন স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের কাছে পৌঁছল, প্রেরিত লোকটা এ মহান সৈনিক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, ইনি হলেন হযরত আমের ইবনে কায়স। মহান আল্লাহ্ সত্যি বলেছেন, "তোমরা যদি কোন কিছু গোপন কর অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা জেনেই নেবেন।"[১]

১. তারীখুত তাবারী ঃ খণ্ড ঃ ৪, পৃষ্ঠা ঃ ১৬।

দয়ালু মুজাহিদ মুসলিম হিরো

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (র.) ছিলেন ইসলামের এক চিরন্তন মুজিযা, আল্লাহ্‌র এক চমৎকার নিদর্শন! তিনিই ক্রুসেড (ইউরোপীয় খৃস্টান) বাহিনীর আক্রমণের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন এবং পাল্টা আক্রমণ করে ইসলামের শত্রু ক্রুসেডারদের কবল থেকে সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ইসলামের দুশমনদের হামলার আশংকা থেকে মুক্ত করেছিলেন আরব উপদ্বীপ ও পবিত্র ভূমিকে।

যে মোবারক মুহূর্তের জন্য সুলতান সালাহুদ্দীনে আইয়ুবী (র.) বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করছিলেন, অদম্য আগ্রহ নিয়ে প্রহর গুণছিলেন, অবশেষে তা ৫৮৩ হিজরীতে ১৭ রবিউল আউয়াল হিত্তীন যুদ্ধের পর পরই তাঁর হাতে ধরা দেয়। আর তা ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দস জয়ের মুহূর্ত। কাজী ইবনে শাদ্দাদ বর্ণনা করেন ঃ

"তাঁর হৃদয়ে পবিত্র কুদসের এমন এক মহান অবস্থা বিরাজ করত যার ধারণ ক্ষমতা পাহাড় পর্যন্ত রাখে না।

৫৮৩ হিজরী সনের ২৭ রজব সুলতান বায়তুল মুক্বাদ্দাসে প্রবেশ করেন। এটা ছিল মুসলমানদের প্রথম ক্বেবলা যেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমস্ত নবীদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন মেরাজের রাতে। সেটা

৯০ বছর পর আবার ইসলামের ছায়াতলে মুসলমানদের করতলে ফিরে এল। মহাপরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার এক বিশেষ অদৃশ্য ব্যবস্থা হলো, সুলতান বায়তুল মুক্কাদ্দাসে ঠিক সে তারিখেই প্রবেশ করেছেন যে তারিখে আল্লাহ্তাআলা তাঁর নবী (সা.)-কে সেখানে হতে মেরাজ দানে সম্মানিত করেছিলেন।

ইবনে শাদ্দাদ আরেক স্থানে লেখেন ঃ

সুলতান অত্যন্ত মানবিক, উদার ও লজ্জাশীল ছিলেন। আগত মেহমানদের জন্যে তিনি সব সময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় থাকতেন। তাঁর কাছে যাঁরাই আসতেন, তাঁদেরকে তিনি সম্মান করতেন যদিও সে কাফের হতো। আমি একদা দেখেছি, নাসিরাহস্থ 'ছিদা'র শাসক তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, সম্মান করেন। তাঁকে নিয়ে খানা খেলেন। সাথে সাথে তাঁর সামনে ইসলাম পেশ করলেন। ইসলামের কিছু কিছু সৌন্দর্য তুলে ধরলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলেন।

সুলতান ছিলেন অত্যন্ত মহানুভব কোমল হৃদয়ের। মজলুম নিপীড়তের জন্যে তাঁর অন্তর কাঁদত। তাদেরকে তিনি সান্ত্বনা ক্ষতিপূরণ দিতেন। ইব্নে শাদ্দাতের গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

"একদিন আমি সুলতানের খেদমতে আরোহী অবস্থায় ছিলাম। আমরা ইংরেজদের মুখোমুখী ছিলাম। এমন সময়

হাজকী সম্প্রদায়ের জনৈক লোক এক মহিলাকে সাথে নিয়ে সুলতানের নিকট এল। মহিলাটি ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল আর কাঁদছিল, কেঁদে কেঁদে অবিরামভাবে নিজ বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিল। হাজকী লোকটা বলল, এই মহিলা ইংরেজদের কাছ থেকে বেরিয়ে আপনার কাছে আসার সুযোগ খুঁজছিল বিধায় তাকে এখানে নিয়ে এলাম। অতঃপর সুলতান দোভাষীকে মহিলাটির ঘটনা জিজ্ঞেস করার আদেশ করলেন। মহিলাটি বলল, মুসলমান চোরেরা গত রাতে আমার তাঁবুতে ঢুকে পড়ে এবং আমার মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে যায়। সকাল অবধি বিগত রাত আমি কাটিয়েছি আর্তনাদ করে করে। পাশের অধিবাসীরা বলল, সুলতান অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। আমরা তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব, তুমি তাঁর নিকট তোমার মেয়ের জন্য আবেদন করো। ফলে তারা আমাকে আপনার দরবারে নিয়ে এল। আমি আপনার কাছ থেকেই আমার মেয়ে ফিরে পাওয়ার আশা রাখি।

শুনে সুলতানের হৃদয় কোমল হয়ে গেল, অশ্রুসজল হয়ে গেল তাঁর চোখ। মানবতা তাঁকে নাড়া দিল। সাথে সাথে তিনি সেনাবাহিনীর বাজারে গমনকারী ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন ছোট্ট মেয়েটির খোঁজ নিতে। কেউ এ রকম কোন মেয়ে ক্রয় করে থাকলে ক্রেতাকে তার মূল্য পরিশোধ করে মেয়েটাকে উপস্থিত করতে বললেন।

সুলতান সেদিন সকাল থেকে নির্যাতিতা মহিলার ব্যাপারটা তদারক করছিলেন। কারণে এক ঘন্টা যেতে না যেতেই প্রেরিত ঘোড়সওয়ার মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে উপস্থিত হলো। ঘোড় সওয়ারকে দেখামাত্রই মহিলা আর স্থির থাকতে পারল না। হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আত্মহারা হয়ে স্বীয় চেহারায় ধুলো মাখতে লাগল। মহিলার অবস্থা দেখে উপস্থিত সবার কান্না এসে গেল। এরপর মহিলা আকাশের পানে চোখ করে কী যেন বলল! তার ভাষা ভিন্ন হওয়ায় আমরা তা বুঝতে পারিনি। তারপর তার মেয়ে তাকে হস্তান্তর করা হলো এবং তাকে তাদের ছাউনিতে পৌঁছে দেয়া হলো।"

এ মহান সুলতানের মৃত্যু হয়েছিল ৫৮৯ হিজরী সনের ২৭ সফর মাসের বুধবার ফজর নামাযের পর। ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ

"সুলতান স্বীয় ভাণ্ডারে মাত্র ৪৭ টি না'ছেরী দেরহাম আর এক টুকরো স্বর্ণ ব্যতীত আর কোন স্বর্ণ রৌপ্য রেখে যান নি। কোন ঘর-বাড়ি জায়গা-জমিন, বাগান-সম্পত্তি, ক্ষেত-খামার কিছুই তিনি পেছনে রেখে যাননি। তাঁর কাফন-দাফনের ব্যাপারে সব কিছুই আমাদের কর্জ করে করতে হয়েছে, এমন কি কবরে লেপ দেয়ার মাটির মূল্য পর্যন্ত। এ অবস্থা দেখে কাফনের প্রয়োজনীয় কাপড় এনেছিল ক্বাজী আল ফাজিল।"

১. আন নাওয়াদিরুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা ঃ ২৫১।

একটি উত্তরে হাজার মানুষের ইসলাম গ্রহণ

তোমরা হয়ত শুনেছ। না শুনলে অচিরেই ইতিহাসের বই-পুস্তকে পড়বে দুর্ধর্ষ তাতারীরা চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে কিভাবে মুসলিম বিশ্বের ওপর হত্যা যজ্ঞ চালিয়েছিল। তা ছিল এক মহাফিৎনা! এক বিরাট পরীক্ষা। এ ফেতনা গোটা মুসলিম জাহানকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। যে দেশ বা যে এলাকাই তাদের সামনে পড়ত, তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো। বিরান ভূমির মত হয়ে যেত। অনেক মুসলিম রাষ্ট্র ও রাজা-বাদশাহ থাকা সত্ত্বেও সুদূরবিস্তৃত মুসলিম জগতে এমন কেউ ছিলেন না, যে এ মহাফেতনার মোকাবেলা করতে পারেন। মানুষের মধ্যে নিরাশা ছেয়ে গিয়েছিল। আশাহত হয়ে গিয়েছিল সবাই, এমন কি মানুষের মধ্যে এ কথা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, "তোমাকে যদি বলা হয়, তাতারীরা পরাজিত হয়েছে, তবে তা তুমি বিশ্বাস করো না।" প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের মতো তাদের সামনে যা-ই পড়ত, তছনছ করে ফেলত। এ ভয়ানক বন্য বাহিনীর ধ্বংসলীলা বোঝার জন্য জনৈক ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকের উক্তিই যথেষ্ট, তিনি তাতার বাহিনীর সেনাপতি চেঙ্গিজ খান সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"এই চেঙ্গিজ খানের পথে যে শহর বা নগরই পড়ত, ভূ-পৃষ্ঠ হতে মিটিয়ে দিত। সে দিনের ধারা পাল্টিয়ে দিয়েছিল। মরুভূমির পর মরুভূমি ভরে গিয়েছিল তার আক্রমণে আতংকিত মৃত্যু পথযাত্রী শরণার্থী দ্বারা। যে সব এলাকায় যুগ যুগ ধরে মানুষ বসবাস করছিল, তার ধ্বংসাত্মক আক্রমণের পর সেখানে ভূতুড়ে অবস্থা বিরাজ করত। মনে হতো, সেখানে কোনো দিন কোনো জীবিত মানুষের বসবাস ছিল না। চারদিকে শোনা যেত কুকুর, বাঘ, চিল, শকুনের আওয়াজ।"

সুতরাং সব ধরনের অনুমান করা গেলেও এবং যে কোন ব্যাপারে মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারলেও কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য ছিল, এই তাতারীরা কোনদিন মুসলমান হবে। সেই বিজিত মুসলমানদের ধর্মের ওপর ঈমান আনবে, যে মুসলমানদের চেয়ে তাদের চোখে লাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট আর কোন জাতি বা মানুষ ছিল না।

কিন্তু অবশেষে সেই অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাই ঘটে গেল! আর তা ঘটেছে আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীকে, ইসলামের একনিষ্ঠ দা'য়ী ও আল্লাহ্ওয়ালা আলেমদের বদৌলতে। সেই আল্লাহ্ওয়ালাদের অনেক ঈমানদীপ্ত কাহিনী হতে একটি কাহিনী তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

কাশগড়ের বাদশাহ'র ছেলে তুঘলক তৈমুর খান ছিলেন তৎকালীন যুবরাজ। তখনও তিনি রাজ্যের

দায়িত্বভার নিয়ে রাজমুকুট পরেন নি। এ যুবরাজের এক সংরক্ষিত এলাকা ছিল। যেখানে তিনি শিকার করতেন, সেখানে তাঁর শিকারের কাজে সহযোগী অনুচর, খাদ্যের পরিচারকরা ছাড়া আর কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না। তখনকার রাজ-বাদশারা নিজেদের শিকারের নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত এলাকাগুলোর ব্যাপারে খুব বেশি যত্নবান ছিলেন এবং অত্যন্ত আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলতেন। অন্যান্য এলাকা থেকে শিকারের এলাকাকে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করে রাখতেন। নিজেদের ইজ্জত ও সম্ভ্রমের মত করে এগুলোর ব্যাপারেও আত্মসম্মান অনুভব করতেন। তাই যুবরাজ ও তাঁর সহযোগী অনুচররা ব্যতীত ওসব সংরক্ষিত এলাকায় ঢোকার কেউ আশা করত না। কেউ সাহসও করত না।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অদৃশ্যভাবে এমন এক ঘটনা ঘটানোর ব্যবস্থা হচ্ছিল, যা তুর্কিস্তানের তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজপরিবারের ভবিষ্যত পাল্টে দেবে। পাল্টে দেবে ওদের ভবিষ্যতও যারা বিধ্বংসী বাহিনীর অনুকরণ করত। যে ঘটনা শিকারের নির্দিষ্ট এলাকার প্রহরার মর্যাদা রক্ষা থেকে তাদেরকে নিয়ে যাবে চিরন্তন সৌভাগ্য রক্ষার পথে, ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষার পথে এবং সে বিশাল বিস্তৃত রাষ্ট্র গড়ার পথে, যা একমাত্র ইসলামেরই অনুগত হবে। সেখানে ইসলামের পতাকাই উড্ডীন হবে। এ বন্য তাতারীদেরকে

ইসলামের প্রতি মনোযোগী করার অনেক কাহিনী হতে একটি কাহিনী তোমাদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি।

একদা শায়খ জামালউদ্দীন বোখারা শহর হতে বের হয়ে একদল বণিকের সাথে এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এলাকাটি যে যুবরাজ ও যুবরাজের সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত, তা তাঁরা জানতেন না। ফলে তাঁরা অজান্তে যুবরাজের সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়েন। পরক্ষণেই এটা রাজকীয় প্রহরীরা জেনে ফেলে। সাথে সাথে তাদের আমীর যুবরাজ এই অনুপ্রবেশকারীদের হাত-পা বেঁধে ফেলার আদেশ দেন। আরো নির্দেশ দেন যেন এ বন্দীদেরকে তার সামনে হাজির করা হয়। এমনিতেই তাতারীরা পারস্যবাসীদের (ইরানীদের)-কে ঘৃণার চোখে দেখত। দরবারে উপস্থিত করার পর যুবরাজ ও শায়খ জামালউদ্দীনের মধ্যে যে কথপোকথন চলেছিল তা নিম্নে দেয়া হল ঃ

ক্রুদ্ধ যুবরাজ বললেন ঃ তোমরা এ এলাকায় ঢোকার সাহস কোত্থেকে পেলে?

শায়খ ঃ আমরা মুসাফির মানুষ। না জেনে আমরা এখানে ঢুকে পড়েছি। আমরা যে একটি নিষিদ্ধ জমির ওপর দিয়ে হাঁটছি তা জানতাম না।

যুবরাজের প্রশ্ন ঃ তোমরা কোন্ জাতি ?

তারা বললেন ঃ পারস্য জাতি।

যুবরাজ বললেন ঃ নিশ্চয় একজন পারস্যবাসীর চেয়ে কুকুরও অনেক দামী।

এ মুহূর্তে মহান আল্লাহ্ শায়খের অন্তরে সেই উত্তরটা জানিয়ে দিলেন যার মাধ্যমে তিনি অদৃশ্য ফয়সালা করে ফেলেছিলেন, এ উত্তরই অপরাজেয়দেরকে জয় করে নেবে, নত করবে সে সব পরাক্রমশালী বিজীয়দেরকে, যে উত্তর এই দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার জন্য যুবরাজের অন্তর খুলে দেবে।

শায়খ বললেন ঃ হ্যাঁ। যদি আমরা সত্য ধর্মাবলম্বী না হতাম তা হলে আমরা মূল্যের দিক দিয়ে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট, অপবিত্র হতাম।

এ উত্তর শুনে যুবরাজ বিস্মিত হলো এবং আদেশ দিলে, শিকার করে ফিরলে এ অসীম সাহসী পারস্যবাসীকে যেন তাঁর নিকট হাজির করা হয়।

পরে যুবরাজ শায়খকে একাকী জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ বাক্যগুলোর অর্থ কি? আর সে দ্বীনই বা কী?

তখন শায়খ অত্যন্ত সাহস ও জোশের সাথে ইসলামের বিধি-বিধান তাঁর সামনে উপস্থাপন করেন। শায়খের মর্মস্পর্শী বর্ণনায় যুবরাজের কলিজা ফেটে যায়, এমন কি মোমের মত গলে যাওয়ার উপক্রম হয়!

শায়খ তাঁর সামনে কুফরের এমন ভয়াবহ চিত্র অংকন করলেন যার প্রত্যক্ষ বর্ণনার আলোকে যুবরাজ এতোদিন

যে ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতেন তার অসারতা ও ভুল সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান।

তবে তিনি বললেনঃ আমি যদি এখন ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে আমি আমার প্রজারদেরকে এই সঠিক পথে আনতে পারব না। তাই আমাকে কিছু দিন সুযোগ দাও। যখন আমার বাপ-দাদার রাজত্ব আমার দায়িত্বে আসবে তখন তুমি আমার নিকট এসো।

শায়খ জামালউদ্দীন নিজ দেশে ফিরে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলেন। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তাঁর ছেলে রশীদ উদ্দীনকে ডেকে বললেন ঃ অচিরেই একদিন না একদিন তুঘলক তৈমুর বাদশাহ হবেন। তখন তুমি তাঁর কাছে যেতে ভুলো না। গিয়ে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবে এবং নির্ভয়ে তাঁকে সেই অঙ্গীকারটা স্মরণ করিয়া দেবে যা তিনি আমার সাথে করেছেন।

অল্প কয়েক বছর পরেই রশীদ উদ্দীন খানদের সেনা ছাউনিতে পৌঁছলেন। তখন যুবরাজ তুঘলক রাজমুকুট পরিহিত। বাপ-দাদার সাম্রাজের মসনদে অধিষ্ঠিত। কিন্তু এ পারস্যবাসী মুসাফির সে পর্যন্ত পৌঁছবে কিভাবে? কিভাবে তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হবেন? অবশেষে রশীদ উদ্দীন এক অনুপম সুন্দর কৌশলের আশ্রয় নিলেন। সুতরাং তিনি রাজপ্রাসাদের প্রতিবেশে থেকে প্রতিদিন আযান দিতে লাগলেন। একদিন ভোর রাতে তাঁর আযানের আওয়াজ নতুন বাদশাহের কানে গিয়ে আঘাত

হানে। এতে তাঁর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে এবং তিনি ক্ষেপে যান। জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে সেই উচ্চকণ্ঠ দুঃসাহসী, যে বাদশার বিশ্রামের পর্যন্ত পরোয়া করছে না, গুরুত্বও দিচ্ছে না?

বাদশাহকে অবহিত করা হলো, সে পারস্যবাসী এক মুসাফির। সে তার ধর্মমতে উচ্চ আওয়াজে আযান দিচ্ছে নামায পড়ার জন্যে। বাদশাহ আদেশ দিলেন যেন তাঁকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়। তখন সুযোগ পেয়ে রশীদ উদ্দীন তাঁর পিতার পয়গাম পৌঁছে দিলেন। সাথে সাথে তুঘলক তৈমুরেরও শায়খের সাথে কৃত অঙ্গীকার স্মরণে পড়ে। তিনি বললেন ঃ সত্যি! আমি বাপদাদার এই মসনদে যখন অধিষ্ঠিত হয়েছি তখন থেকেই সেই অঙ্গীকার আমার মনে আছে? কিন্তু কি ব্যাপার! শায়খ নিজে আসেন নি কেন? রশীদ উদ্দীন জানালেন, তিনি তো এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে পরকালের বাসিন্দা হয়েছেন! এ খবর শুনে বাদশাহ একদিকে যেমন মর্মাহত হন, অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের সেবা করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হন। সাথে সাথে বাদশাহ কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একের পর এক আমীরদেরকেও আহ্বান জানান, তাঁদের সামনে ইসলাম পেশ করেন। তাঁরাও সবাই ইসলাম কবুল করেন। এভাবে চারদিকে ইসলামের সূর্য চমকে উঠল। তার উজ্জ্বল আভায় ধীরে

ধীরে আঁধার মিটে গেল। লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল।

এভাবে ইসলামের একনিষ্ঠ দাঈদের, আল্লাহ্ওয়ালা আলেমগণ ও প্রভাব বিস্তারকারী উপদেশকারীদের বদৌলতে তাতারীদের মধ্যে ও রাজ্য শাসনকারী রাজপরিবারসমূহে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। জনৈক বড় ইংরেজ ইতিহাসবিদের ভাষায়॥ অবিবেচনায় ভারাক্রান্ত ইসলামের প্রথম শ্রেষ্ঠ সনাতন মর্যাদা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। মুসলিম দাঈর (প্রচারক) মাধ্যমে ঐ সব অপরাজেয় বিজয়কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে, যারা মুসলিম নির্যাতনে নিজেদের সমস্ত চেষ্টা ব্যয় করেছিল। ইসলামের প্রচারকগণ মুসলমান বিদ্বেষী লোকদেরকে পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে।[১]

তুঘলক তৈমুরের প্রশ্নের জবাবে শায়খ জামালউদ্দীনের মুখ দিয়ে আল্লাহ্প্রদত্ত যে উত্তর হয়েছিল, বন্য তাতীরীদের পরবর্তী বংশধরদের একটি বিরাট শাখায় ইসলাম প্রসারে সে উত্তরের বড় অবদান ছিল। এ রকম এখলাস ও ঈমানপ্রসূত কিছু কিছু বাক্য, যদি সাথে আল্লাহ্র তাওফীক থাকে, তাহলে তা ক্রিয়ার দিক দিয়ে অনেক বড় সেনাবাহিনী, অজস্র অস্ত্রসম্ভার ও দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধের চেয়েও প্রভাবশালী হয়।

১. প্রফেসর আর্লোল্ড ঃ আদ দাওয়াতু ইলাল ইসলাম পৃষ্ঠা ঃ ২২৭।

ক্ষমাকারী ও আপোসকারীর পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে

নবী করীম (সা.), সাহাবায়ে কেরাম ও খেলাফতে রাশেদার বরকতময় যুগের অনেক ঘটনা ও কাহিনী আমরা পড়েছি। তার পরে এমন যুগের কাহিনীও আমরা পড়েছি এবং শুনেছি, যখন সর্বত্র আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ ছিল, সবখানে রাসূলের (সা.) জীবনাচার ও শিক্ষাই উত্তম আদর্শরূপে পরিগণিত হতো। যখন সব জায়গায় কল্যাণের জয়যাত্রা ছিল, সমুন্নত ছিল দ্বীনের মান-মর্যাদা।

এভাবে ইসলামের মহীরুহ যুগে যুগে নিজের ফল দিয়ে আসছে। নিরন্তর মধু বিলিয়ে আসছে এর মৌচাক। এখানে ঈমানদীপ্ত চারিত্রিক উৎকর্ষের দু'টি ঐতিহাসিক কাহিনী তোমাদের সামনে বর্ণনা করব।

এ কাহিনী দুটির সময়কাল হলো হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী। এ যখন সৈয়দ আহমদ ইবনে ইরফার শহীদ (রহ.) [১২০১-১২৪৬ হিজরী] ভারতবর্ষে তাক্বওয়া, সহীহ আকীদা বিশ্বাস, সুন্নতের অনুশীলন, জিহাদ ও শাহাদাতের তামান্না, আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের ভিত্তিতে একটি দল তৈরির কাজ আন্‌জাম দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ ছিল ইসলামের কেন্দ্র হতে অনেক দূরে। যখন ভারতবর্ষ

চরিত্র, আক্বীদা ও বিভিন্ন ধরনের দ্বীনী পরীক্ষায় যেমন জর্জরিত ছিল, তেমনি এখানে বলবৎ ছিল বিকৃত, দুর্বল বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ভারতে তখন মানুষের ওপর, পরিবারের ওপর, সাধারণ জনজীবনের ওপর, সর্বোপরি সমাজের ওপর শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের জন্যে খেলাফতে রাশেদার নীতিতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সৈয়দ সাহেব (র.) জিহাদ করেছেন, প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সেই ইসলামী সংস্কার আন্দোলন ও আত্মিক বিপ্লবের বিস্ময়ভরা ইতিহাস হতে দু'টি কাহিনী উৎকলিত করছি এখানে।

তার একটি হলো, সৈয়দ সাহেবের দলে এক বিনয়ী-বিনম্র খাদেম ছিল, যাকে সবাই লাহোরী বলে ডাকত। সে মুজাহিদদের ঘোড়ার দেখাশোনা করত। একদিন এনায়াতুল্লাহ নামক জনৈক ব্যক্তির সাথে তার ঝগড়া হয়ে যায়। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন সৈয়দ সাহেবের খুবই প্রিয়ভাজন ও প্রাথমিক সাথীদের অন্যতম। সুতরাং ঝগড়ার এক পর্যায়ে তাঁর খুব রাগ উঠল এবং লাহোরীকে এমন জোরে এক থাপ্পড় মারল, যার তোড়ে লাহোরী জমিনে পড়ে বেদনায় গড়াগড়ি খেতে লাগল।

এই খবর সৈয়দ সাহেব পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তিনি পুরো ঘটনা তদন্ত করার পর এনায়াতুল্লাহ খানকে ডাকলেন এবং খুব তিরস্কার করলেন। বললেন ঃ আমার

নিকট তোমার বিশেষ স্থান ও পরিচিতি, আর লোকটার তেমন স্থান নেই বলেই হয়তো তুমি এই দুঃসাহস করেছ। সাবধান, তুমি সেই ধোঁকায় পড়ো না! কারণ তুমি আর লাহোরী আমার কাছে সমান। একের ওপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সব মানুষ এখানে এসে জমায়েত হয়েছে একমাত্র দ্বীনের স্বার্থে। সৈয়দ সাহেব উভয়ের মামলা সেনা ছাউনির বিচারকের হওয়ালা করে বললেন, উভয়ের ব্যাপারে কোন ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা শিথিলতা যেন প্রদর্শিত না হয়! আল্লাহ্প্রদত্ত দিকনির্দেশনা মতে তাদের মাঝে বিচার করবেন, দুর্নীতিকারীদের পক্ষপাতী হবেন না।

ব্যাপারটা একেবারে স্পষ্ট ছিল। আর তা হলো, লাহোরী এনায়াতুল্লাহ থেকে কেসাস বা বদলা নেবে। লাহোরী ঠিকভাবে তাকে থাপ্পড় মারবে যেভাবে সে লাহোরীকে মেরেছিল। কারণ একে অপরকে আহত করার মধ্যেও কেসাস রয়েছে। কিন্তু লোকেরা সবাই অনিষ্ট ও ফেতনার আশংকা করছিল। তাদের ভয় হচ্ছিল, কেসাস বা বদলা নিতে গিয়ে ঘটনা যদি কোন অশুভ পরিণতি বয়ে আনে! এতে এনায়াতুল্লাহ্র ক্ষেপে যাওয়ার আশংকা ছিল। হতে পারে সে লাহোরীর ওপর চটে গিয়ে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো আঘাত করে বসবে। ফলে লোকদের মাঝে নতুন একটা ফেতনার সৃষ্টি হবে।

লোকেরা চেষ্টা করল, লাহোরী যেন তার হক ছেড়ে দেয়। আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াবের আশায় ও ফেতনা এড়ানোর লক্ষ্যে তার কাছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যেন মাফ করে দেয়। বিচারক তাকে সন্তুষ্টি করতে চাইলেন। লোকেরা সবাই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। সবাই তাকে বলল, তুমি তোমার সাথীকে মাফ করে পাওনা ছেড়ে দিলে আল্লাহ্‌র দরবারে এর জন্যে মহাপ্রতিদান পাবে। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি মাফ করে দেবে এবং মীমাংসা করে দেবে, তার সওয়াব বা প্রতিদান আল্লাহ্‌র যিম্মায়। আর যে ধৈর্য ধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে সেটা নিশ্চয় বড়ই সাহসের কাজ। (সূরা শূরা ৪০-৪৩)

আর তুমি যদি তোমার হক নিয়ে ফেল, তা হলে তো তুমি আর তোমার সাথী বরাবর হয়ে গেলে! আল্লাহ্‌র দরবারে কোন ধরনের মূল্যায়ন ও সওয়াব বা প্রতিদান পাবে না।

লাহোরী অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বলল, আমি যদি আমার হক নিই, আমার সাথী থেকে কেসাস নিই তাতে কি আমার ওপর কোন গোনাহ হবে? লোকেরা বলল না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাঁর ওপর কোন অভিযোগ নেই।" (সূরা শূরা ৪২)

লাহোরী বলল ঃ তা হলে তো আমি আমার হক নেব এবং আমার সাথী থেকে কেসাস নেব।

তখন লোকেরা নিরাশ হয়ে গেল। বিচারক এনায়াতুল্লাহ্‌কে লাহোরীর সামনে উপস্থিত করে বললেন, নাও লাহোরী। অপরাধী তোমার সামনে হাজির। যেভাবে সে তোমাকে আঘাত করেছিল, তুমি সেভাবে তাকে আঘাত করে কেসাস নাও।

লাহোরী বলল; এটা কি আমার হক, আমি তাকে ঠিক সেভাবে তাকে আঘাত করব, যেভাবে সে আমাকে করেছিল এবং তার থেকে কেসাস নেব?

বিচারক বললেন, হ্যাঁ।

উপস্থিত সবাই পেরেশান হয়ে গেল। তারা নিশ্চিত মনে করে নিল, লাহোরী তাকে আঘাত করে তার থেকে কেসাস নেবেই।

তখন লাহোরী বলে উঠল, হে লোকেরা! তোমরা সবাই সাক্ষী থেকো, বিচারক আমার হক আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। আমার নিকট আমার ঋণগ্রস্ত অপরাধীকে হাওয়ালা করেছেন এবং তিনি এ মর্মে তাঁর ফায়সালা করে দিয়েছেন।

এখন আমি আমার প্রতিপক্ষের ওপর পুরোপুরি ক্ষমতাবান। কেসাস নেয়ার কাজে আমাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। এমন কিছু নেই যা আমার আর তার মধ্যে

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং কারো ভয়ও আমার অন্তরে নেই। কিন্তু ভাইসব, তোমরা সাক্ষী থেকো! আমি আমার ভাইকে মাফ করে দিলাম। আমি আমার হক একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াব ও তাঁর সন্তুষ্টির আশায় ছেড়ে দিলাম।

এ বলে লাহোরী এগিয়ে গিয়ে এনায়াতুল্লাহ্‌কে আলিঙ্গন করল। তাকে সিনার সাথে লাগিয়ে নিল এবং হাতে হাত মেলাল। এ অভিনব দৃশ্য দেখে উপস্থিত লোকেরা সবাই মারহাবা মারহাবা বলে স্লোগান তুলল। সবাই বলল, আল্লাহ্‌ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, হে লাহোরী! আল্লাহ্‌র তোমার মঙ্গল করুন, তুমি একটা কাজের মত কাজ করেছ। বীরদের মতোই কাজ করে দেখিয়েছে। হ্যাঁ, এভাবে লাহোরী সেদিন আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীর ওপর আমল করে দেখিয়েছিল। মহান আল্লাহ্‌র এরশাদ করেছেন॥

"এবং যারা অক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই, যে ক্ষমা করে এবং আপস করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা : শূরা ৪০-৪২)

যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃতওয়াদা পূর্ণ করেছে

১২৮০ হিঃ, ১৮৬৪ সালের ২রা মে। আম্বালার আদালতে ইংরেজ বিচারক এডওয়ার্ড নিজ আসন গ্রহণ করেছে। মামলায় মতামত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্যে উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন শহরের চারজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। এঁদের সামনে উপস্থিত করা হলো এ রকম ১১ জন ব্যক্তিকে, যাঁদের চেহারা ও চাল-চলনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, এঁরা নির্দোষ, দোষী ব্যক্তি হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছিল। কারণ বলা হচ্ছিল যে, এঁরা ভারতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যেহেতু তাঁরা আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় সৈয়দ আহমদ ইবনে ইরফান শহীদ (র.) ও ইসমাঈল শহীদ (র.)-এর সহযোগীদেরকে অর্থ ও জনবল দিয়ে সাহায্য করছিলেন। এ অর্থ ও জনবল তাঁরা দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে গোপনে বিস্ময়কর কৌশলের মাধ্যমে সেখানে পাঠাতো। এ উদ্দেশে তাঁদের সাথে পত্র যোগাযোগের জন্য তাঁরা একটি ইঙ্গিতবহ ভাষারও জন্ম দিয়েছিল। স্বয়ং ইংরেজদের প্রজাদের কাছ থেকে চাঁদা-সাহায্য নিয়ে তারা বিদ্রোহীদের কেন্দ্রে প্রেরণ করত। ইংরেজ সেনাবাহিনীর ভেতরের এক মুসলিম সেনার গোপন তথ্যের ভিত্তিতেই

সরকার এটা জানতে পেরেছে এবং সাথে সাথে পাটনা, থানেশ্বর ও লাহোরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে বিচারালয়ের হাওয়ালা করা হয়েছে। আজ তাঁদের সম্পর্কে বিচারের রায় ঘোষণা করা হবে।

আদালত প্রাঙ্গণ দর্শনার্থীদের ভিড়ে ভরপুর। সব আসরে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ওই গ্রেপ্তারকৃতদের মামলাটাই। এক পর্যায়ে রায় ঘোষণার সময় ঘনিয়ে এল। সবার বিস্ফারিত দৃষ্টি বিচারকের দিকে। রায় ঘোষণার জন্য কান খাড়া করে, অস্থির মন নিয়ে অপেক্ষা করছিল সবাই। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। হঠাৎ বিচারক অত্যন্ত রাগের সুরে নীরবতা ভঙ্গ করল এবং সামনে উপস্থিত অভিযুক্তদের মধ্যে শক্তিশালী সুদর্শন যুবকটিকে দেখতে ভদ্র ঘরের ও আদর-যত্নে লালিত-পালিত বলে মনে হচ্ছিল, সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে জাফর! নিশ্চয় তুমি তো একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান পুরুষ। রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে তোমার ভাল জ্ঞান রয়েছে। তুমি তোমার শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্যতম। কিন্তু তুমি তোমার বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান ব্যয় করেছ রাষ্ট্রদ্রোহিতায় ও রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের মধ্যে। ভারত থেকে বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে অর্থ ও জনবল পাচার কাজে। তুমিই মধ্যস্থতাকারী। শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার জেদ ও অস্বীকারের মধ্যেই থাকলে। একটুও প্রমাণিত হলো না, তুমি রাষ্ট্রের একজন একনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী। নাও, আমি

এখন তোমার ওপর ফাঁসির রায় ঘোষণা করছি। ঘোষণা করছি, তোমার স্থাবর-অস্থাবর সকল ধন-সম্পদ যেন বাজেয়াপ্ত করা হয়। আর ফাঁসির পর তোমার লাশ তোমার উত্তরসুরিদের নিকট হস্তান্তর করা হবে না, বরং অত্যন্ত অবমাননার সাথে দুর্ভাগাদের কবরস্থানে তা কবরস্থ করা হবে। যখন আমি তোমাকে ফাঁসিতে লটকানো অবস্থায় দেখব, তখনই নিজেকে আনন্দিত ও সৌভাগ্যবান বলে মনে করব।"

যুবকটি ধীর ও শান্তির সাথে এ রায় শুনল। তার মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন ও অস্থিরতা পরিলক্ষিত হলো না। বিচারক যখন তার কথা সমাপ্ত করলেন, তখন মুহাম্মদ জাফর বললেন, মানুষের জান-আত্মা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হাতে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। আর হে বিচারক! আপনি না কারো জীবনের মালিক না মৃত্যুর মালিক। আপনি জানেন না, আমাদের মধ্যে থেকে কে আগে মৃত্যুর ঘাটের দিকে অগ্রসর হবে। কবির ভাষায়॥

আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না, অথচ ভয় হয় প্রতি পলে

আমাদের মাঝে কার কাছে মরণ আসিবে আগে সকালে।

লোকটি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। উন্মাদনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু সেতো তার শেষ তীরটিও

ছুড়ে ফেলেছিল। এখন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। মুহাম্মদ জাফর খুশির মধ্যে ছিলেন যখন তাঁর বিচারের রায় ঘোষিত হচ্ছিল। আনন্দে তাঁর চেহারা ঝলমল করছিল। যেন জান্নাত, জান্নাতের হুরও জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ তাঁর চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ভাসছে। তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন॥

এটারই প্রতীক্ষা ছিল দীর্ঘ সময়কাল ধরে,

তাই মানুষের উচিত আল্লাহ্‌র জন্যে কৃতওয়াদা যেন পূরণ করে।

এই দৃশ দেখে উপস্থিত লোকেরা যার পর নাই অবাক হলো। বার্সন নামক জনৈক ইংরেজ অফিসার মুহাম্মদ জাফরের নিকট গিয়ে বলল! এ রকম তো আর কোনদিন দেখিনি, তোমার ফাঁসির রায় শোনানো হলো, অথচ তুমি খুশি, হাসছ। মুহাম্মদ জাফর বললেন, আমি কেন খুশি হব না, কেন হাসব না? আল্লাহ্ তা'আলা যে আমাকে তাঁর পথে শাহাদাত নসীব করেছেন। আর তুমি বেচারা কি করে বুঝবে সেই শাহাদাতের স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ!"

বিচারক অন্য দু'জন সম্পর্কে ফাঁসির রায় দিয়েছিল। তাদের একজন ছিল জনৈক বৃদ্ধ। তার চোখে-মুখে নেক্কার ও ইবাদত গোজারদের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। তিনি সানন্দে কৃতজ্ঞতার সাথে এ রায় গ্রহণ করেছেন। আর তিনি হলেন এই জামা'তের আমীর মাওলানা ইয়াহইয়া আলী

সাদেকপুরী। দ্বিতীয় জন ছিলেন এক যুবক। বেশভূষায় তাকে ধনী ও বড় ব্যবসায়ী মনে হচ্ছিল। তিনি মূলত পা াবের অধিবাসী ছিলেন। নাম হাজী মুহাম্মদ শফী। বাকী আট জনের ক্ষেত্রে চিরনির্বাসনের রায় ঘোষণা করা হয়।

উপস্থিত সবাই রায় শুনে অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হলো। নয়ন অশ্রুসজল হয়ে গেল। অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল দু'চোখ বেয়ে। উপস্থিত নারী-পুরুষ সবাই কারাগার পর্যন্ত গোটা পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল এই মজলুমদের করুণ দৃশ্য। আর তাঁদের সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

এক সময় তাঁরা কারাগারে পৌঁছে গেল। সেখানে তাঁদের পরিহিত পোশাক খুলে ফেলা হলো। পরিয়ে দেয়া হলো আসামীদের পোশাক। তাঁদের তিনজনের প্রত্যেককে এমন এক সংকীর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হলো, যেখানে কোন দিক দিয়ে আলো-বাতাস ঢোকার পথ ছিল না। তাঁরা সেখানে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অত্যন্ত বীভৎস এক কালো রাত কাটালেন। পরদিন সকালে খোলা ময়দানে রাত যাপনের অনুমোদন নিয়ে বার্তা এল।

ইতোমধ্যে কারারক্ষীরা তাঁদের সামনেই ফাঁসির কাষ্ঠ ও রশি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাঁরা এ সব কিছুই স্থির নিশ্চিন্তে অবলোকন করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মনে কোন ভয় নেই এবং চিন্তারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না তাঁদের চেহারায়। তবে তাঁদের মধ্যে মাওলানা ইয়াহইয়া আলীকে তুলনামূলক বেশি আনন্দিত দেখাচ্ছিল

যেন তিনি জান্নাতের মধ্যে জান্নাতের আগ্রহ পোষণ করছেন। নেয়ামতের মধ্যে থেকেই নেয়ামতের প্রতীক্ষায় আছেন। তিনি আবেগ- আগ্রহের কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, বিশেষত সাহাবী হযরত খুবায়ব (রা.)-র সেই কবিতা, যা তিনি ফাঁসির সময় আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

যবে আমি নিহত হই মুসলিম হওয়ায়
নেই কোন মোর পরওয়া
যেভাবে, যে পাশেই হোক তা
আল্লাহ্‌র জন্যই মোর যাওয়া
সেটা তো প্রভুরই পথে
যদি তিনি চান,
করতে পারেন প্রতিটি অঙ্গে মোর
বরকত দান।

এভাবে তার সাথীরাও ছিল খুশী হাস্যোজ্জ্বল। তাঁদের মন শান্ত, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। অন্তর সন্তুষ্ট ও আনন্দে আপ্লুত। নামায দোয়ায় তাঁদের অত্যন্ত খুশু এবং ইবাদতে প্রাণচাঞ্চল্য দেখার মত ছিল। পুরো সময়টা কাটত যিকির, তসবীহ, কুরআন করীম তেলোয়াত ও আবেগ-আগ্রহের বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তির মধ্যে।

যে ইংরেজ বিচারক এ তিনজনের ফাঁসির রায় দিয়েছিল, এ নিপীড়নমূলক রায় ঘোষণার পর পরই তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। আর ইংরেজ অফিসার বার্সন, যে

মুহাম্মদ জাফরকে গ্রেফতার করেছিল এবং একদিন সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত পিটিয়েছিল, সে পাগল হয়ে গেল। এই পাগলামির মধ্যেই যে নিকৃষ্ট মৃত্যুবরণ করেছে। মুহাম্মদ জাফর তাকে যেভাবে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন, তার অবস্থাও তাই হয়েছে। সহীহ হাদীসে এসেছে, "অনেক এলোমেলো কেশ ও ধুলোমাখা বান্দা আছে, যারা আল্লাহ্‌র নামে কোন শপথ করে বসলে আল্লাহ্ তা সত্য করে দেখান।"

কারাগারে প্রতিদিন প্রচুর ইংরেজ নারী-পুরুষ আসত। এ সব বন্দীকে নিয়ে খেল-তামাশা করত। দুশমনের পরিণতি দেখে হাসত। তারা এঁদের আনন্দ ও প্রাণ চাঞ্চল্য দেখে খুব আশ্চর্য বোধ করত। ওরা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করত, হে বন্দীরা, কী ব্যাপার! তোমাদের কোন দুঃখ নেই যে! অথচ তোমরা একেবারে মৃত্যুর দুয়ারে। ফাঁসির দিনক্ষণ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। তাঁরা ওদেরকে জবাব দিতো, এটা সেই শাহাদাত লাভের কারণে, যে শাহাদাতের চেয়ে বড় কোন নেয়ামত, কোন সৌভাগ্য হতে পারে না।

এ সব দর্শনার্থী ফিরে গিয়ে ইংরেজ শাসকদের বন্দীদের চোখে দেখা কানে শোনা সব খুলে বলত। এতে শাসকরা আরো রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ত। কিন্তু করবেটা কি? ওদেরকে ছেড়ে দিলে তো দুশমনকে ছেড়ে দেয়া হলো! ওরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ছেড়ে দিলে

আবার সেই কাজে ফিরে যাবে। আর যদি তাদেরকে ফাঁসি দেয়া হয়, মেরে ফেলা হয়, তা হলে তো তাদেরকে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যেই পৌঁছে দেয়া হলো। তাদের আনন্দের কাজে সহযোগিতা করা হলো। এর প্রতিটিই ইংরেজদের জন্য কষ্টকর। তাদের আত্মা এতে কোনদিন সন্তুষ্ট হবে না। সুতরাং তারা এ ব্যাপারে খুব চিন্তা করল। চিন্তা করতে করতে এক সময় হত্যা ও ছেড়ে দেয়ার মাঝামাঝি আরেকটা পথের তারা সন্ধান পেয়ে গেল। ইংরেজরা আসলে আইন-কানুনের দিক দিয়ে বড়ই চতুর জাতি ছিল।

সুতরাং শহরের ইংরেজ শাসক একদিন কারাগারে এসে সেই তিনজনের সামনে যাঁদেরকে ইতোপূর্বে ফাঁসির রায় দেয়া হয়েছিল, আপীল কোর্টের নতুন রায় পড়ে শোনাল॥

"হে বিদ্রোহীরা, তোমরা ফাঁসিতে ঝোলা পছন্দ করেছ এবং সেটাকে আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাত হিসেবে গণ্য করেছ। আমরা চাই না, তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিই, তোমাদেরকে আনন্দিত করি। এজন্যে আমরা তোমাদের ফাঁসির রায় রহিত করে সাইলান দ্বীপপুঞ্জে চিরনির্বাসনের রায় ঘোষণা করছি।"

তাঁরা ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছেন। শায়খ ইয়াহইয়া সেখানে দু'ই বছর পর ইনতেকাল করেন। এই দুই বছর তিনি কাটিয়েছিলেন ইবাদত, দ্বীন, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে। তাঁর

ইনতেকাল ১২৮৪ হি. (২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮) সালে হয়েছিল। আর শায়খ মুহাম্মদ জাফরকে দীর্ঘ আঠারো বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর ১৮৮৩ সালের বাইশ জানুয়ারী ছেড়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন ঃ

"মুমিনদের মধ্যে কিছু কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্র কৃত ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করেছে, তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, আর কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে, তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করে নি।"[১] (সূরা আহযাব॥২৩)

১. ঘটনাদ্বয় লেখকের গ্রন্থ 'ইযা হাব্বাত রীহুল ইমান' হতে সংগৃহীত।